ওরা শুধু ভুল করে যায়

শান্তনু সিংহ

ওরা শুধু ভুল করে যায়

শান্তনু সিংহ

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ
২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

প্রকাশক ঃ অমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়
অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ
২৭/১বি, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ ঃ অক্টোবর, ১৯৮৮
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৮৮
তৃতীয় সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০
চতুর্থ সংস্করণ ঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ ২৩ জানুয়ারী, ১৯৯৮

©অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ

প্রচ্ছদ ঃ মলয় কর্মকার

মূল্য ঃ পনেরো টাকা মাত্র

মুদ্রক :
কম্পিউটার গ্রাফিক্স
কলিকাতা-৬

প্রাপ্তিস্থান

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলিকাতা—৬

সংঘ বস্তুভাণ্ডার
কেশব ভবন
৯এ, অভেদানন্দ রোড
কলিকাতা—৬

জ্ঞান প্রকাশন
২৩/১, কলেজ রো
কলিকাতা—৯

বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা—৭৩

মুখবন্ধ

প্রচলিত অর্থে আমি কোন ঐতিহাসিক নই। গবেষকও নই। কিন্তু ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে দৈনন্দিন ঘটনাবলীর একজন অংশীদার। ১৯৭০-'৭১-এর দিনগুলি আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। তখন আমি ফাইভ-সিক্সের ছাত্র। সকাল হতেই শুনতাম বোমা ফাটার শব্দ। ছুরি-পাইপগান নিয়ে ছোটাছুটি করতেন পাড়ার দাদারা। মাঝে মাঝেই কেউ আহত হয়ে ফিরতেন। কেউ হয়ত কোনদিন ফিরতেনই না। বাড়িতে ফিস ফিস আলোচনা শুনতাম, অমুক খুন হয়ে গেছে।

সেই সময় একটা শব্দের সঙ্গে খুব পরিচিত ছিলাম, 'নকশাল'। বন্ধুদের দাদাদের দেখতাম, তাঁরা বুক বাজিয়ে নিজেদের 'নকশাল' বলে পরিচয় দিতেন। তাঁদের কাছেই শুনতাম পুলিশ মেরে তাঁরা দেশের কত উপকার করছেন।

আজ অতীতের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠি, ভাগ্যিস তখন ছোট ছিলাম। নতুবা আমিও হয়ত বন্ধুর রক্তে হাত রাঙ্গাতাম, পুলিশ মারতাম, হয়ত বা পুলিশের গুলিতে মারাও যেতাম। পরে ক্রমে ক্রমে জেনেছি নকশাল আন্দোলনের আন্দোলিত দিনগুলির কথা। এবং আরও পরে জেনেছি এদেশে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের ইতিহাস। আর এ ব্যাপারে আমি অকুণ্ঠ ঋণী আমার শ্রদ্ধেয় পিতৃদেবের কাছে, যিনি অতীতের এক এনসাইক্লোপেডিয়া হিসাবে আমার কাছে খুলে দিয়েছেন তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি।

এদেশের কম্যুনিষ্ট আন্দোলন আজ যৌবনের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে। বিগত আটষট্টি বছরে ভারতে কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে সে প্রশ্নের ভিতর না গেলেও যে প্রশ্নটা থেকেই যায়, তা হল এই যে, ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি ও আন্দোলন আজ শতধা বিভক্ত কেন? 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' স্লোগানে গগন বিদীর্ণ করছেন যাঁরা, তাঁরা নিজেরাই মিলতে পারছেন না কেন—এ প্রশ্ন শুধু ভারতের সাধারণ মানুষকেই বিভ্রান্ত করছে না, কিউবার কম্যুনিষ্ট নেতা ফিদেল কাস্ত্রোকেও যারপর নাই বিস্মিত করেছিল।

কিন্তু এদেশে কম্যুনিষ্টদের এই হাল হল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই আবিষ্কৃত হয়েছে 'এত রঙ্গে ভরা' এক বিচিত্র রহস্যপূর্ণ উপন্যাস।

কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের সামগ্রিক ইতিহাস এই স্বল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই কিছু বিশেষ ঘটনাবলীর সমাবেশ এখানে ঘটানো হয়েছে। তাই কোন কোন জায়গায় ছন্দ হয়ত কেটে গেছে। এই ত্রুটির জন্য পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় বন্ধুবর তপন কুমার ঘোষ, সোমাংশু শেখর দাস ও পল্লব ব্যানার্জী তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। আমার অনুজপ্রতিম সহকর্মী সৌম্য চ্যাটার্জী, অসিতবরণ কয়াল এবং বিদ্যার্থী পরিষদের আরও অনেক কর্মীর প্রচেষ্টা এই বইটি প্রকাশে যুক্ত আছে।

যদি এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আগামী প্রজন্মকে পথভ্রষ্ট হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে পারে, তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক।

কলকাতা
অক্টোবর, ১৯৮৮

শান্তনু সিংহ

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আমরা আনন্দিত, গর্বিতও বটে। আশাতীত অল্প সময়ের মধ্যে এই বইটির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে গেল। বর্তমান সংস্করণটি পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হল। এই সংস্করণে আরও এমন কিছু তথ্য যোগ করা হল যা প্রথম সংস্করণে ছিল না। প্রামাণ্য দলিল যোগাড়ের জন্য তরুণ লেখককে অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। বইটির বিপুল চাহিদার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি গুণগ্রাহী পাঠক সমাজকে। বইটির অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটিগুলি জানিয়ে সচেতন পাঠকরা লেখককে উৎসাহিত করবেন এই আশা রাখি।

কলকাতা
২০।১২।৮৮

প্রকাশক

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

গল্প-উপন্যাস নয়। একটি রাজনৈতিক বিকৃতির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। তাও আবার একটি ছাত্র সংগঠনের প্রকাশনা মাত্র। কিন্তু মাত্র ১৬ মাসের মধ্যেই তৃতীয় সংস্করণ বের করতে হচ্ছে। থমকে দাঁড়াতে হয় বৈকি। রাজনৈতিক দলিল মানেই কতকগুলি নীরস তথ্যের বস্তাপচা শব্দের সমাবেশ নয়। বরং অতীতের বুকে এক সাবলীল পদচারণা। পাঠক একে গ্রহণ করেছেন। স্বীকৃতি ও অভিনন্দনে আপ্লুত করেছেন লেখককে। উৎসাহিত আমরা, পাঠককে ধন্যবাদ জানিয়ে এই তৃতীয় সংস্করণ তাঁদের হাতে তুলে দিলাম।

কলকাতা
১০।২।৯০

প্রকাশক

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

বইটি প্রকাশের সময় কল্পনাও করা যায়নি যে তিন বছরেরও কম সময়ের ব্যবধানে বইটির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করতে হবে। নিশ্চিতভাবেই পশ্চিমবাংলার শিক্ষিত মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তনের এটা একটা সূচক। এই সূচক আমাদেরকে অধিকতর আত্মবিশ্বাসী করে তুলছে যে আমরা অচিরেই সক্ষম হব পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙ্গালীকে কমিউনিজমের ভাইরাস মুক্ত করতে।

কলকাতা
১০।৯।৯১

প্রকাশক

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

আমরা আনন্দিত, গর্বিতও বটে। আশাতীত অল্প সময়ের মধ্যে এ পর্যন্ত প্রকাশিত বইটির সমস্ত সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে গেছে। বর্তমান সংস্করণটি পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হল। এই সংস্করণে আরও এমন কিছু তথ্য যোগ করা হল যা এর আগের সংস্করণে ছিল না। যতটা সম্ভব ত্রুটিমুক্ত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে এই সংস্করণটিকে। তবুও সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন, এই দাবী করছি না। বইটির বিপুল চাহিদার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি গুণগ্রাহী পাঠক সমাজকে। বইটির অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটিগুলি জানিয়ে সচেতন পাঠকরা উৎসাহিত করবেন এই আশা রাখি।

কলকাতা **প্রকাশক**

২৩।১।৯৮

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বিপ্লব চারিদিকে

পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই অমিত চৌধুরী এলাকায় একটি অতি পরিচিত নাম। সৎ, সজ্জন, সামাজিক। ফ্রি কোচিং সেন্টার, চ্যারিটেবল্ ডিসপেন্সারি, বুক ব্যাঙ্ক—অমিত চৌধুরীর উপস্থিতি সর্বত্র। বয়স্করা তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা করেন— 'অমিত জন্ম হইতেই সমাজসেবী'। হাসপাতাল থেকে শ্মশান— অমিত চৌধুরীর অনুপস্থিতিই একটা ঘটনা।

ষাটের দশকের নকশাল আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন অমিত চৌধুরী। নেতৃত্বের নির্দেশে বাড়ি ঘর ছেড়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গিয়েছিলেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জীবনের সেখানেই ইতি। ঐ দিনগুলির কথা বলতে গেলে কী যেন এক আজানা নেশায় চোখ দুটো চক্চক্ করে ওঠে। হাসতে হাসতে বলেন 'সিগেরেটের ছ্যাঁকার মালা যারা পরেনি তারা আবার কম্যুনিস্ট কিসের ?' 'থানা লক-আপে আমাদের উলঙ্গ করে রাখা হত, উপরওয়ালাদের নির্দেশে দৈত্যের মতো চেহারার বিহারী কনেস্টবলরা আমাদের পেটাতো, মলদ্বারে রুল ঢুকিয়ে দিত। টর্চার চেম্বারে জল চাইলে আমাদের মুখে পেচ্ছাপ করে দিত ঐ কনেস্টবেলরা।' অমিত চৌধুরী বাড়িয়ে বলেন না। তাঁর গলায় নেকলেস পরিয়ে দিয়েছিল সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের পুলিশ। গলায় সিগারেটের ছ্যাঁকার নেকলেসের দাগ এ জীবনে আর উঠবে না। আজ অমিত চৌধুরী আর কম্যুনিস্ট নন। নকশাল তো নন বটেই। পুলিশের অত্যাচার তাঁকে নকশাল আন্দোলন থেকে সরে আসতে বাধ্য করেনি। তাঁর নিজের কথায়, 'সেই দুনিয়া কাঁপানো দিনগুলির মতো আমি এখনও spirited। আমি এখনও বিশ্বাস করি শ্রমিকদের ক্ষমতা দখল করা উচিৎ। এই দেশে গণতন্ত্র আইওয়াশ ছাড়া কিছুই নয়। পার্লামেন্ট হলো চোরদের আখড়া। হাওলা—গাওলা কেলেঙ্কারী এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এই সমস্ত সিস্টেমটাই ভেঙ্গে ফেলা উচিৎ।' কিন্তু তবুও আমিত চৌধুরী কম্যুনিস্ট নন। তাঁর নিজের কথায়, 'আমার maturity থাকলে সেদিনও আমি কম্যুনিস্ট হতাম না। আমরা সেদিন exploited হয়েছিলাম। বয়স ছিল আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। emotion ছিল আমাদের একমাত্র অস্ত্র। আমাদের এই দুর্বলতাই কাজে লাগিয়েছিলেন নেতারা। তাঁদের স্বপ্নালু ভাষণ আমাদের চিন্তাশক্তি কেড়ে নিয়েছিল। ভিয়েৎনামের বিপ্লবীদের প্রতি সমর্থন জানাতে আমরা আমাদের বন্ধুকেই খুন করেছিলাম।'

যদিও নিও-নকশালিস্ট বিপ্লব নাহা বিশ্বাসের মত হল, বুর্জোয়া শক্তি, পুলিশ ও সমাজবিরোধীদের জোট নকশাল আন্দোলনকে বিপথে পরিচালিত করেছিল। মূর্তি ভাঙ্গা বা মানুষ খুন করা নকশালদের নীতি নয়। কিন্তু ভুলে গেছেন তৎকালীন নকশালদের

মুখপত্রে লেখা হয়েছিল 'বিপ্লবী যুব ছাত্রদের মূর্তি ভাঙার অভিযানে প্রতিক্রিয়াশীল শাসক ও তাদের বেতনভুক্ত বুদ্ধিজীবি মহলে কান্নাকাটি পড়ে গেছে' (দেশব্রতী ৫-৯-'৭০)।

ষাটের দশকের শেষে রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, সুভাষ বোসের মূর্তি ভেঙ্গে, স্কুল কলেজের উপর আক্রমণ চালিয়ে, নিরস্ত্র ট্রাফিক পুলিশকে খুন করে (তখন ট্রাফিক পুলিশদের কাছে রিভলবার থাকত না) এদেশে বিপ্লব করতে চেয়েছিলেন যাঁরা, তাঁরা আমাদের কাছে নকশাল নামে পরিচিত। 'যার হাত শ্রেণীশত্রুর রক্তে রাঙানো নয়, সে কম্যুনিষ্ট নয়', কিংবা 'শ্রেণীশত্রুর লাল রক্তেই লাল বিপ্লব শক্তিশালী হবে'—এই সমস্ত মন মাতানো স্লোগান তুলে, যুব সম্প্রদায়কে খুনের নেশায় মাতিয়ে একটা জেনারেশনকে ধ্বংস করেছেন যাঁরা, আজ আশির দশকে তাঁরা বুঝতে পেরেছেন, ভারতবর্ষ কেন, বিশ্বের কোথাও এইভাবে বিপ্লব সম্ভব নয়। 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান', 'বন্দুকের নলই-শক্তির উৎস', 'বাংলা হবে ভিয়েতনাম' শ্লোগানসর্বস্ব নকশালপন্থীরা বিপ্লব শুরুর এক দশক পর বুঝতে পারলেন, চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান হতে পারেন না ; ঠিক যেভাবে রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী চীনের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেননি। বন্দুকের নল নয়, জনগণই শক্তির উৎস। ভিয়েতনামের সুসংগঠিত কৃষকশ্রেণী আদ্যন্ত দেশপ্রেমিক, তথাকথিত আন্তর্জাতিকতাবাদী নয়।

বিপ্লবের ব্যর্থতা, উদ্দেশ্যের প্রতি সংশয় এবং সর্বোপরি দীর্ঘ দশ বছরের আত্মোপলব্ধি নকশালদের এটুকু রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়েছে, বিপ্লব জিনিসটা সুদে ধার করা যায় না, কিংবা পাল্লায় বাটখারা চাপিয়ে দেবার মত জনসাধারণের উপর ওটা চাপিয়ে দেওয়া যায় না।

নকশাল আন্দোলনের অন্যতম নেতা অসীম চ্যাটার্জী কিছুদিন আগে এক প্রবন্ধে দাবী করেছেন, 'ভারতের কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে নকশালবাড়ির এক ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে.....'। কিন্তু এই ঐতিহাসিক ভূমিকাটা যে কত করুণ, কত রক্তাক্ত তা আমরা জানি। প্রেসিডেন্সী-স্কটিশ-যাদবপুর মার্কা কিছু উচ্চবিত্ত শহুরে বিপ্লবী, যাঁদের না ছিল দেশের মানুষের মানসিকতা সম্পর্কে সামান্যতম ধারণা, না ছিল দেশের ইতিহাস-ভূগোল সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান, তথাকথিত বিপ্লবের নামে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন আঠারো বছরের দামাল বয়সকে। খুনের নেশায় মাতিয়ে তোলা হয়েছিল যুব সম্প্রদায়কে। শ্রেণীশত্রু বানিয়ে হাজারো মানুষকে খুন করা হয়েছিল যাঁদের কেউই শোষণের হাতিয়ার ছিলেন না। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তাঁরই 'বিপ্লবী' ছাত্রদের হাতে খুন হয়েছিলেন লাল পতাকায় আর একটু রক্তিমতার ছোঁয়া দেওয়ার জন্য।

কিন্তু এই হাজারো শ্রেণীশত্রু খতমের বায়না যাঁরা নিয়েছিলেন, তাঁরা কেউই শ্রমিক কৃষক পরিবার থেকে আসেন নি। অ্যাডভেঞ্চারের নেশা এই সৌখিন যুবকদের দলে টেনে এনেছিল। আর এই অ্যাডভেঞ্চারের রেশ ধরে রাখতে প্রয়োজন হয়েছিল প্রফেশনাল গুণ্ডাদের, যারা শ্রেণীহীন সমাজের পরিবর্তে সৃষ্টি করেছিল এক সমাজহীন শ্রেণী। দলের চিন্তাশীল যুবকদের সঠিক পথে চালানোর জন্যও প্রয়োজন হয়েছিল এইসব

সমাজবিরোধীদের। কারণ, প্রথম থেকেই কিছু বেয়াড়া যুবক খতম লাইনের বিরোধিতা করছিলেন। নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আঙ্গুল তোলা এইসব যুবকদের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি স্লোগান ঠিক করে দিয়েছিলেন, 'যে যত পড়ে- সে তত মূর্খ হয়'। আর এই মূর্খ হওয়ার পরিণাম ছিল শ্রেণীশত্রু হিসাবে খুন হয়ে যাওয়া। সমস্ত কিছুর নীট ফল, নকশালরা ভারতবর্ষে কোন ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারেননি, বরং ইতিহাস হয়ে গেলেন।

আজ অবশ্য নকশালরা তাঁদের ভুল স্বীকার করছেন। কিন্তু সেদিন এই বিপ্লবীরা বলতে পারেননি, এই পথ ভুল। বরং এই ভুল পথে যাঁরা পা বাড়াতে চাননি, তাঁদেরই রক্তে রাঙানো হয়েছিল লাল পতাকা। হাজার হাজার তরুণের সাহস আর উদ্যম, যা হয়ত পারত একটা দেশের চেহারা পালটে দিতে, তা লাগানো হয়েছিল বিধবা মার একমাত্র সন্তানকে খুন করে তাঁকে পুত্রহীনা অনাথা করে দেবার কাজে। মানুষের থেকে স্লোগান যাদের কাছে বড়, তাদের সাফল্য দেশকে যে কোথায় নিয়ে যেত তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়।

নকশাল আন্দোলন ভারতবাসীর স্মৃতিতে এক পৈশাচিক বিভীষিকা হলেও এই পৈশাচিক রক্তাক্ত আন্দোলনকে সমর্থন করতে এগিয়ে এসেছিল চীনের কম্যুনিষ্ট সরকার। বিপ্লবের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠন করবার উদ্দেশ্যে পিকিং রেডিও থেকে প্রচার করা হয়েছিল, 'ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দার্জিলিং জেলার গ্রামাঞ্চলে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট বিপ্লবীদের নেতৃত্বে কৃষকরা সশস্ত্র সংগ্রামের একটি অধ্যায় শুরু করেছে। মাও সে তুং-এর শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এটা হচ্ছে ভারতীয় জনগণ দ্বারা সংঘটিত বৈপ্লবিক সশস্ত্র সংগ্রামের প্রথম পদক্ষেপ।'[১]

কিন্তু চীন এই নকশাল আন্দোলন সমর্থন করেছিল সম্পূর্ণ নিজের স্বার্থে, ভারতের জনগণের এক কানাকড়ি লাভের জন্যও নয়। প্রথমত, আদর্শগতভাবে আন্দোলনটি ছিল সম্পূর্ণ তাদের অনুগত এবং স্বার্থবাহী। কম্যুনিষ্ট দুনিয়ায় বন্ধুহীন চীন নিজের প্রভাব বিস্তারের এই সুযোগ ছাড়তে চাইছিল না। অপর কারণটি, যা আরো বেশী তাৎপর্যপূর্ণ, তা হল নকশাল আন্দোলনের উৎপত্তিস্থল নকশালবাড়ি। উত্তরবঙ্গে এই অঞ্চলটির ভৌগোলিক অবস্থান বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) আন্তর্জাতিক সীমারেখা তিতালিয়ার খুব কাছে, নেপাল থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে এবং চীন দখলীকৃত তিব্বত থেকে মাত্র দু'ঘণ্টার পথ। স্বাভাবিক কারণেই, ভারতের আঁতেল বিপ্লবীদের এই বিপ্লব ত্বরান্বিত করতে ভারতে সৈন্য প্রেরণ এবং ভারতের কিছু জায়গা দখলের (১৯৬২ সলের মত) এই সুযোগ চীন ছাড়তে রাজি ছিল না।

অবশ্য এর আগেও চল্লিশের দশকের শেষ ভাগে ভারতের কম্যুনিষ্টরা এদেশে রক্তাক্ত সর্বহারার বিপ্লব করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে নেহরু-নেতৃত্বাধীন 'বুর্জোয়া সরকারে'র বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানানো হয়েছিল। ইতিমধ্যে ১৯৪৭-এর জুলাই মাসে রাশিয়ার এশিয়া

বিশেষজ্ঞ ঝুকভ এদেশের কম্যুনিষ্টদের পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন যে নেহরু প্রতিক্রিয়াশীল চক্রকে মদত দিচ্ছেন ও সাম্রাজ্যবাদের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছেন। ১৯৪৭ সালের জুন মাসে কম্যুনিষ্টদের তরফ থেকে আসন্ন নেহরু সরকারের 'চরিত্র' সম্বন্ধে মস্কোর যে মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল, ঝুকভের বক্তব্য ছিল তারই উত্তর।

যুদ্ধোত্তর এশিয়ার দেশগুলিতে তখন কম্যুনিষ্টদের নীতি কী হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করার জন্য রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত World Federation of Democratic Youth and the International Union of Students-এর উদ্যোগে ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী (২৪-২৭) মাসে কলকাতায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি 'Youth Conference' অনুষ্ঠিত হয়। এর দীর্ঘ বৈঠকে স্থির হয় যে স্থানীয় কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সদ্য স্বাধীন দেশগুলিতে তাদের নিজ নিজ জাতীয় সরকারগুলির বিরুদ্ধে একযোগে হিংসাত্মক সংগ্রাম শুরু করবে।[২] অবশ্য এর আগেই ১৯৪৭-এর সেপ্টেম্বর মাসে পোল্যান্ডে অনুষ্ঠিত কমিন্টার্ন-এর সভায় রুশ তাত্ত্বিক ঝানভ্ (Zdhanov) সদ্য স্বাধীন দেশগুলির বুর্জোয়া সরকারগুলির বিরুদ্ধে সার্বিক আক্রমণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। কলকাতায় অনুষ্ঠিত পার্টি কংগ্রেসে (১৯৪৮) তাই ঝানভ্-এর 'tough line'-এর বাস্তব প্রয়োগ করার আহ্বান জানানো হল। ঝানভ্ লাইন-এর বক্তব্য ছিল, ভারতের ও দক্ষিণ এশিয়ার জাতীয় আন্দোলনগুলি বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাই এদের বিরুদ্ধে ন্যায় বা অন্যায় যেভাবেই হোক লড়াই করতে হবে।[৩]

অতএব 'সত্যিকারের স্বাধীনতা'র জন্য কম্যুনিষ্টরা নেহরু সরকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, দিয়াকভের (Dyakov) ভাষায় যে সরকার হল 'Public Enemy Number Three next to U.S.A and Britain।'[৪] শুরু হল গেরিলা কায়দায় তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ।

ইতিহাসের পরিহাস, নেহেরু সরকারের বিরুদ্ধে এই খণ্ডযুদ্ধে কম্যুনিষ্টরা সেই গেরিলা শিক্ষাই প্রয়োগ করলেন যা তাঁরা পেয়েছিলেন বিদেশী ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ধ্বংস করার জন্য।[৫] সন্ত্রাস সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তরুণ কম্যুনিষ্টদের যত্রতত্র অ্যাসিড বোমা ছুঁড়ে মারার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যা রণদিভের 'Acid Bomb in city phase' বলে খ্যাত হয়ে আছে। কম্যুনিষ্টদের এই সন্ত্রাসের হাত থেকে অবুঝ শিশুও বাদ গেল না। হায়দ্রাবাদে মুসলিম রাজাকারদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কম্যুনিষ্টরা তেলেঙ্গানার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বল্গাহীন সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। এখানে কম্যুনিষ্টরা অন্তত দু-হাজার লোককে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করেছিলেন। শিশুদেরও জীবন্ত-আগুনে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, এবং তা করা হয়েছিল কমরেডদের যুদ্ধং দেহী মানসিকতা ধরে রাখার জন্য।[৬] দমদমে জেসপ কারখানায় কর্মরত কয়েকজন বৃটিশ অফিসারকেও বিপ্লবের নামে সেখানকার জ্বলন্ত চুল্লীতে ফেলে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।* কম্যুনিষ্ট নেতৃত্ব থেকেও পরে স্বীকার করা হয়েছিল,

---

* এ অপরাধে পান্নালাল দাশগুপ্তের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। কিন্তু পরে জেলখানায় পান্নালাল দাশগুপ্ত গান্ধিবাদী হয়ে যাওয়ায় তিনি মুক্তি পান।

'কংগ্রেসী সরকারের সামরিক শক্তির মোকাবিলা না করতে পেরে গেরিলা বাহিনীগুলি তেলেঙ্গানা অঞ্চলে অপ্রয়োজনীয়ভাবে দেশমুখ, পাটোয়ারি, হোমগার্ড প্রভৃতি অসামরিক ব্যক্তিদের নির্বিচারে হত্যা করায় মেতে যায়।'[৭] (indulged in a lot of indiscriminate and unnecessary killing of nonmilitary individuals such as Deshmukhs, Patwaris, Home guards, etc.)

এইভাবে তেলেঙ্গানায় নেহরু-সরকার বিরোধী এত জোরদার সশস্ত্র আন্দোলনের সাফল্যে জঙ্গীনেতা বি টি রণদিভে যখন খুশিতে ডগমগ, ঠিক তখনই বড় একটা চ্যালেঞ্জ-এর সম্মুখীন হতে হল তাঁকে। অন্ধ স্ট্যালিনভক্ত রণদিভেকে (তাঁর স্ট্যালিন ভক্তির আতিশয্য এত বেশী ছিল যে ১৯৪৯-এ চীনে কম্যুনিষ্টরা ক্ষমতায় আসার সাথে সাথেই তিনি মাও সে তুং-কে অভিনন্দন জানান এই বলে যে 'victory of Marxism-Leninism of the Stalinist Line'.[৮]) অন্ধ্রপ্রদেশের কমরেডরাই সাফ জানিয়ে দিলেন, চীনের পথেই ভারতে বিপ্লব আসবে। আশ্চর্য্য জনকভাবে রুশ তাত্ত্বিক দিয়াকভও কৃষক অভ্যুত্থানের ব্যাপারে চীনা পন্থারই বিশেষ গুরুত্ব দিলেন। ফলে রণদিভের 'Marxist Doctrine and Russian Experience' তত্ত্ব খারিজ হয়ে গেল এবং সেখানে 'Maoist Practice and Chinese Experience' গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হল। অতএব রণদিভে পিছু হটতে বাধ্য হলেন এবং পার্টির সম্পাদক পদটি হারালেন। ১৯৫০ সালে নতুন সম্পাদক নিযুক্ত হলেন রাজেশ্বর রাও।[৯]

নেহরুর বুর্জোয়া সরকারের বিরুদ্ধে এই বালখিল্য বিপ্লব নতুন করে যে সত্যটা উদ্‌ঘাটিত করল তা হল, কম্যুনিষ্টরা তখনও রাশিয়ার প্রতি তাঁদের আনুগত্য অস্বীকার করেননি। কেন করেন নি, এটা বুঝতে হলেই আমাদের জানতে হবে ভারতের কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের অঙ্কুরোদগমের ইতিহাস।

ভারতীয়তার স্থান নেই

এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক যে দুটি কারণে পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান পেয়েছে তার একটি হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং অপরটি রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব। মেহনতী মানুষও যে ইতিহাস গড়তে পারে, রুশ বিপ্লবের সাফল্য যেন বিশ্বের দরবারে এই বিস্ময়কর নতুন সংবাদ পৌঁছে দিচ্ছিল। রুশ বিপ্লবের স্লোগান 'শান্তি, রুটি ও জমি' যেন সমস্ত পৃথিবীকে মথিত করছিল। বিশেষত ইউরোপের বুদ্ধিজীবি ও শ্রমিক মহলে রুশ বিপ্লব এক ব্যাপক উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল। ফরাসী দার্শনিক রোমা রল্যাঁ থেকে সাধারণ মজুর, প্রত্যেকে রুশ বিপ্লবকেই এই বিশ্বের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মুক্তির আন্দোলন বলে মনে করেছিলেন। এমনকি ইউরোপের শ্রমিকরা নবগঠিত রাশিয়ার প্রতি ইউরোপীয় বুর্জোয়া সরকারগুলির শত্রুমনোভাবের প্রতিবাদে ব্যাপক ধর্মঘটেও সামিল হয়েছিলেন।

ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবি এবং রাজনৈতিক মহলেও রুশ বিপ্লব এক বিশেষ উৎসাহের

সৃষ্টি করেছিল। রাশিয়ার পথেই ভারতবর্ষ ইংরেজ শাসন থেকে মুক্ত হতে পারবে, কোন কোন মহল থেকে এরকম ধারণাও পোষণ করা হচ্ছিল। এমনকি নরমপন্থী অহিংসায় বিশ্বাসী কংগ্রেসীরাও রুশ বিপ্লব দ্বারা এভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, জহরলাল নেহরু সেই সময়ের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন 'কংগ্রেসের মধ্যে যেসব তরুণ তরুণীরা একসময় ব্রাইস-এর গণতন্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তক এবং মর্লে, কিথ, ম্যাজিনি প্রভৃতির বইপত্র পড়তে অভ্যস্ত ছিল, তারা এখন রাশিয়ার সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের উপর কোন বই হাতে পেলে তাতেই ডুবে থাকে।'[১০]

রাজনৈতিক কারণে স্বাভাবিকভাবেই রুশ বিপ্লবের সাফল্যে সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন চরমপন্থী কয়েকজন বিপ্লবী যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাযতীন) শিষ্য মানবেন্দ্রনাথ রায় (পূর্বনাম ছিল নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য) এবং রাসবিহারী বোসের শিষ্য অবনী মুখার্জী।

১৯১৪ সালে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবের তখন দ্বিতীয় যুগ। এই যুগের দুই প্রধান সেনানী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং রাসবিহারী বোস যুদ্ধের সুযোগে ইংরেজ-সরকারকে চরম আঘাত করতে চাইছিলেন। তাই বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানির উদ্দেশ্যে তাঁরা তাঁদের দুই প্রধান অনুগামী যথাক্রমে এম এন রায় এবং অবনী মুখার্জীকে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন বিদেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, বাঘাযতীন সম্মুখ সমরে ইংরেজদের হাতে নিহত হলেন। কৃপাল সিং-এর বিশ্বাসঘাতকতায় রাসবিহারী বোসের সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। অন্যদিকে এম এন রায় এবং অবনী মুখার্জী দুজনই বিদেশে কম্যুনিজম-এর মতবাদে দীক্ষিত হলেন এবং ১৯২০ সালে মস্কোয় অনুষ্ঠিত 'দ্বিতীয় কম্যুনিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল'-এ যোগ দিলেন।

বলশেভিকরা রাশিয়ায় ক্ষমতায় আসার পরই চাইছিলেন কম্যুনিষ্ট বিপ্লব এশিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য দেশেও বিস্তার লাভ করুক এবং এ ব্যাপারে তাঁদের লোভাতুর নজর ছিল ভারতবর্ষ ও চিনের দিকে। তাই এম এন রায় এবং অবনী মুখার্জীর মত intellectual giant রাশিয়া সঠিকভাবেই নির্বাচিত করেছিল। ভারতবর্ষে কম্যুনিষ্ট বিপ্লব প্রসারিত করতে আফগানিস্তান, সিংকিয়াং, পার্শিয়া প্রভৃতি জায়গায়, 'Lines of Communication' তৈরী করা হল এবং ভারতে বলশেভিক বিপ্লবের উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে প্রচুর এজেন্ট রিক্রুট করা হল। কিন্তু এদের অধিকাংশই মতাদর্শের দিক থেকে কম্যুনিষ্ট ছিলেন না। 'সামান্য কিছু রাজনৈতিক কারণে দেশ থেকে নির্বাসিত ব্যক্তি ও কিছু ছন্নছাড়া বুদ্ধিজীবি ছাড়া একেবারে প্রথম দিকে কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যদের বেশীরভাগই সংগৃহীত হয়েছিল ধর্মোন্মাদ মুজাহিরদের ভিতর থেকে, যারা ১৯১৯-এর আফগান যুদ্ধের প্রতিবাদে 'অপবিত্র ভারতবর্ষ' ছেড়ে চলে যায়। এদের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করা হয়েছিল। কিন্তু এর ফল হয় সামান্যই।....মজিদ, শওকত উসমানী, ফজল-ই-ইলাহী কুরবান প্রভৃতিরা এই গোষ্ঠীতে ছিলেন।'[১১] এছাড়াও ছিলেন মুহম্মদ শফীক সিদ্দিকী, মুহম্মদ আলী, মউসদ আলী শাহ্, আকবর শাহ্ প্রমুখ মুজাহিরগণ।[১২]

১৯২০ সালের ১৭ই অক্টোবর সাতজন সভ্য নিয়ে রাশিয়ার তাশকন্দের মাটিতে প্রথম ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠিত হল। কিন্তু রায় যেভাবে আশা করেছিলেন, ভারতে কম্যুনিষ্টদের অগ্রগতি সেভাবে হল না। বরং জাতীয় রাজনৈতিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে দেশে কম্যুনিষ্টদের অগ্রগতি তখন প্রায় শূন্য। ইতিমধ্যে রায়ের সঙ্গে বোম্বের কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীপাদ ডাঙ্গের বিরোধ বেধেছে। কমিন্টার্ন থেকে রায়কে সরিয়ে ভারতের কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব পরিবর্তন করা হল। নতুন নেতা মনোনীত হলেন লন্ডন-প্রবাসী রজনী পাম দত্ত।[১৩] কিন্তু এতেও ভারতে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে আশানুরূপ অগ্রগতি হচ্ছে না দেখে রাশিয়ার এশিয়া বিশেষজ্ঞ জিনোভিয়েভ (Zinoviev) এর নির্দেশে ভারতের কম্যুনিষ্ট আন্দোলনকে সরাসরি বৃটেনের কম্যুনিষ্ট পার্টির (Communist party of Great Britain, CPGB) নিয়ন্ত্রণাধীন করা হল।[১৪]একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক AD Riencourt মন্তব্য করেছেন, 'ভারতের কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের ভাগ্যে এটা একটা বিস্ময়কর ঘটনা যে ১৯২০-র দশকে এই আন্দোলন প্রধানত ইউরোপীয়দের দ্বারাই সংগঠিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিল। পার্সি গ্ল্যাডিংস, ফিলিপ, স্প্রাট, বেঞ্জামিন ফ্রান্সিস ব্রাডলি, হ্যুগ লেস্টার হাচিনসন এবং আরও অনেক ইংরেজ এদেশে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলেন এবং রাশিয়ার টাকা ভারতে পাচারের ব্যবস্থা করেন।[১৫] রাশিয়ার টাকা ভারতে পাঠানোর আরও কিছু ঘটনা এবং নেতাদের সেই টাকা মেরে দেওয়ার পারস্পরিক অভিযোগের কথা বিশিষ্ট কমুনিষ্ট নেতা মুজফ্ফর আহ্‌মেদের লেখা 'আমার জীবন ও ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি' বইটিতে পাওয়া যায়।

অবিশ্বাস্য হলেও এটা সত্যি যে এই সময় বৃটিশ সরকারও এদেশে মার্কসবাদ প্রচারে উৎসাহী হয়ে পড়ল। ১৯২৪ সালে কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলায় মুজফ্ফর আহ্‌মেদ প্রমুখ কম্যুনিষ্ট নেতারা বন্দী হয়েছিলেন। এই মামলা পরিচালনার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইংরেজ সরকারের হোম্ মেম্বার সার ম্যালকম্ হেইলী তাঁদের আইন উপদেষ্টা মিঃ এস আর দাসকে ১১.২.২৪ তারিখে চিঠিতে লেখেন, 'ধৃত ব্যক্তিদেরকে কঠোর শাস্তিদান বর্তমান মামলার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, বরং সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্রটিকে ভালভাবে তুলে ধরাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।[১৬] আর সেই উদ্দেশ্যেই সরকারের অনুরোধে অ্যাসোসিয়েটের প্রেস ও রয়টারের প্রতিনিধিরা সবসময় কোর্টে উপস্থিত থাকলেন এবং সমস্ত খবরের কাগজে তা প্রচারের ব্যবস্থা করা হল।[১৭] অর্থাৎ কম্যুনিষ্টরা অনেক চেষ্টা করেও তাঁদের যা প্রচার করতে পারেননি, ইংরেজ সরকারই সেই দায়িত্ব নিল। মুজফফর আহ্‌মেদের কথায়, 'যে সব দলিল মোকদ্দমার exhibit হয়েছে তার টুকরো টুকরো অংশ সংবাদপত্রে মুদ্রিতও হয়েছে। এগুলি পড়ে অনেকে আরও বেশী পড়ার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছেন।...১৯২৮ সাল পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন যে অনেক শক্তি সঞ্চয় করল তাতে কানপুর মোকদ্দমারও কিছু অবদান আছে।'[১৮]

যে সমস্ত জেলে বিপ্লবীরা বন্দী ছিলেন, সেখানে ঢালাওভাবে মার্কসবাদী সাহিত্য

পাঠানোর ব্যবস্থা করল ইংরেজ সরকার। এমনকি আন্দামানের জেলেও এগুলি প্রচুর পরিমাণে পাঠানো হয়েছিল।[১৯]

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী মতবাদ কম্যুনিজমের প্রতি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই বদান্যতার কারণ কি? এর একমাত্র কারণ ছিল ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিভ্রান্ত করে দেওয়া। বিদেশী ইংরেজের বিরুদ্ধে দেশের সশস্ত্র বিপ্লবকে শ্রেণীসংগ্রামের নামে ভ্রাতৃঘাতী গৃহযুদ্ধে পরিণত করে দেওয়া। সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাসের মতে, 'কণ্টক দ্বারা কণ্টক উচ্ছেদ নীতির সাহায্যে তদানীন্তন ইংরেজ সরকার নানাভাবে কম্যুনিজমকে প্রশ্রয় দিতে থাকেন।' [আত্মস্মৃতি, শনিবারের চিঠি, ভাদ্র—১৩৬২]

এদিকে আর একটি বিশেষ ঘটনা ভারতের কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের ইতিহাসে ঘটে গেছে। কানপুরের কম্যুনিষ্ট নেতা সত্যভক্ত (যদিও মূলত তিনি নাগপুরের লোক ছিলেন) 'The Indian Communist Party' গড়ার প্রচেষ্টায় ১৯২৫ সালের ২৬শে ডিসেম্বর কানপুরে একটি কম্যুনিষ্ট কনফারেন্স ডাকেন। কম্যুনিষ্টদের ডাকে ভারতে এই প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশন। এই অধিবেশনে রাশিয়া ও তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সঙ্গে সমস্ত রকম সম্পর্ক অস্বীকার করে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি (Indian Communist Party) গঠন করার কথা বলা হল। কিন্তু রাশিয়াপন্থী রায় এতে ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন। এই সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গার করে তিনি দাবী করলেন, যারা রাশিয়ার শ্রমিকদের সঙ্গে নিজেদের আত্মীয়তা স্বীকার করে না তারা যে শুধু কম্যুনিষ্ট নয় তাই নয়, তারা ভারতের শ্রমিক শ্রেণীরও শত্রু।[২০]

মুজফ্ফর আহ্‌মেদ প্রমুখ কম্যুনিষ্ট নেতারাও ভারতের কম্যুনিজমে ভারতীয়ত্ব (Indianness) আনার তীব্র বিরোধিতা করলেন। খাঁটি কম্যুনিষ্ট হিসাবে রাশিয়ার নেতৃত্ব এবং guidance তাঁরা কোনভাবেই অস্বীকার করতে পারলেন না। 'Ahmed and his Comrades rejected the suggestion on the plea that the Comintern would not approve of it.'[২১] অতএব ভারতের কম্যুনিজমকে আর 'ভারতীয়ত্বের নোংরা পোষাক' গায়ে দিতে হল না। সত্যভক্ত Indian Communist Party গড়তে ব্যর্থ হয়ে কনফারেন্স ছেড়ে চলে গেলেন।[২২] ১৯২৫ সালের ২৬শে ডিসেম্বর কানপুরে ভারতের মাটিতে এই প্রথম Communist party of India (CPI) প্রতিষ্ঠিত হল। যদিও দেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত এই প্রথম সম্মেলন, মুজফ্ফর আহ্‌মেদের চোখে 'কানপুরের কম্যুনিষ্ট কনফারেন্সকে আমি একটি লজ্জাকর ব্যাপার মনে করি'।[২৩] কারণ, এই সম্মেলনের উদ্যোক্তারা তাঁর ভাষায়, 'ইণ্ডিয়ান কম্যুনিষ্ট পার্টিওয়ালা ছিল'।[২৪] সুতরাং বর্তমানে CPI(M) এই দিনটিকে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে মানে না। তারা তাশকন্দে পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবসটিকেই পালন করে। কিন্তু CPI এই দিনটিকে তাদের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে পালন করে।

সত্যভক্ত পরেও আর একটি National Communist Party গঠন করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সফল হন নি।[২৫]

ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি (Indian Communist Party) না হয়ে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি (Communist Party of India) হওয়ার ফল হল মারাত্মক। অন্ধ রুশ আনুগত্য কম্যুনিষ্টদের মধ্যে এমন এক স্বপ্নালু উন্মাদনার সৃষ্টি করল যে তাঁরা ভাবতে শিখলেন, রাশিয়ার স্বার্থই ভারতের স্বার্থ। ভারতের ক্ষতির মূল্যেও তাঁদের রাশিয়ার স্বার্থ রক্ষা করা উচিৎ। এবং এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তাঁরা ৪০-এর দশকে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করে পৃথিবীর কলঙ্কতম বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাসের সূচনা করেছিলেন।

নির্দেশিকা

লেখকের নাম, গ্রন্থ-পত্রিকা বা নথির নাম, পত্রিকার তারিখ, এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা—এই পর্যায়ক্রমে উল্লেখিত হল।

১। G S Bhargava: The Statesman : 20.10.'87.
২। M R Masani: The Communist Party of India—A Short History, P. 71,72.
৩। A D Riencourt: The Soul of India, P. 378.
৪। M R Masani: The Com. Party of India, P. 77.
৫। Dr A K Majumdar: Advent of Independence, P. 190.
৬। Hyderabad Govt. report: Communist Crimes in Hyderabad.
৭। Madhu Limaye: Communist party—Facts and Fictions, P. 62.
৮। M R Masani: The Com. party of India, p. 79.
৯। M Limaye: Com. Party, P. 71.
১০। Jawaharlal Nehru: Toward Freedom, P. 232.
১১। M R Masani: The Com. Party of India, P. 10,11.
১২। মুজফ্ফর আহমেদ: আমার জীবন ও ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি, পৃ. ৫৮।
১৩। M R Masnai—The Com. Party of India, P. 13,14.
১৪। ঐ; P. 13.
১৫। A D Riencourt: The Soul of India, P. 371.
১৬। অমলেন্দু ঘোষ: ভারতে কম্যুনিজম, পৃ. ৫৩।
১৭। ঐ: পৃ ৫৪।
১৮। মুজফ্ফর আহমেদ: আমার জীবন ও ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি, পৃ ৪৭৪।
১৯। Marshall Windmiller & Overstreet: Communism in India, P. 136.
২০। ঐ;P.70.
২১। Satindra Singha: Illustrated Weekly: 9.1.'77.
২২। মুজফ্ফর আহমেদ: আমার জীবন ও ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি, পৃ ৫১৯।
২৩। ঐ; পৃ ৫২৪।
২৪। ঐ; পৃ ৫২৩।
২৫। ঐ; পৃ ৫১৯।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নজিরবিহীন বিশ্বাসঘাতকতা

৩০-এর দশকের শেষভাগে সমস্ত বিশ্বে যে দমবন্ধ করা যুদ্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল ভারতবর্ষ তা থেকে মুক্ত ছিল না। কিন্তু অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের পার্থক্য ছিল এই যে, ভারতবর্ষ তখন ছিল ইংরেজদের অধীন, এবং সেই কারণে যুদ্ধের ব্যাপারে ভারতবাসীর কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না। কিন্তু ভারতবর্ষের পক্ষে এই যুদ্ধের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত ইংরেজ সরকারকে আঘাত হানার ওটাই ছিল সব চাইতে উপযুক্ত সময়। কংগ্রেস যদিও ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনের বিরোধী ছিল, কিন্তু যুদ্ধে যোগদানের পূর্ব শর্ত হিসাবে তাঁরা দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করতে থাকেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়ার পরও গান্ধীজী দৃঢ়ভাবে ভারতের স্বাধীনতার দাবী ব্যক্ত করতে থাকেন, যদিও যুদ্ধের সুযোগে ইংরেজ সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করবার বিরোধী ছিলেন তিনি। গান্ধীজীর এই অদ্ভুত নীতি সুভাষচন্দ্র বোস প্রমুখ চরমপন্থী নেতারা মেনে নিতে পারলেন না। কেননা তাঁদের মতে ওটাই ছিল বৃটিশ শাসন ও শোষণ অবসানের মহেন্দ্রক্ষণ।

ইতিমধ্যে ১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর, যেদিন বৃটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করল, সেদিন ভারতের বৃটিশ বড়লাটও সঙ্গে সঙ্গে ভারতকেও যুদ্ধরত বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো এতবড় একটা ঘোষণা করতে গিয়ে ভারতীয় জনমতের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করলেন না। বরং পরাধীন ভারতকে জোরপূর্বক যুদ্ধের মুখে ঠেলে দেওয়া হল।

ঐ বছরের ১৪-ই সেপ্টেম্বর দীর্ঘ আলোচনার পর কংগ্রেস থেকে যে বিবৃতি প্রচার করা হল, তাতে স্পষ্ট করে বলা হল যে এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় পরিচালিত হচ্ছে এবং এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য ভারতে ও অন্যান্য দেশে সাম্রাজ্যবাদকে পরিপুষ্ট করা। সুতরাং কংগ্রেস এই যুদ্ধের সাথে কোন সম্পর্ক রাখতে কিংবা সহযোগিতা করতে পারে না। এ ছাড়াও কংগ্রেস সরাসরি বৃটিশ সরকারের কাছে জানতে চাইল যুদ্ধের উদ্দেশ্য কী তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হোক। কিন্তু অদ্ভুতভাবে এই সময় কংগ্রেস ইংরেজ বিরোধী কোন আন্দোলনের কথা ঘোষণা করল না।

কংগ্রেসের এই অদ্ভুত আচরণ কম্যুনিষ্ট মহলেও যথেষ্ট ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। চরমপন্থীদের মতো বামপন্থীদেরও বিশ্বাস ছিল ওটাই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুদ্ধের উৎকৃষ্ট সময়। ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির পলিটব্যুরোর প্রস্তাবেও স্পষ্ট করে বলা হল, 'দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যুদ্ধকালীন

সংকটকে বৈপ্লবিকভাবে ব্যবহার করা—নতুন পরিস্থিতিতে এটাই হল সমস্ত জাতীয়তাবাদী শক্তির কাছে এখন মুখ্য কর্তব্য।' (Revolutionary utilisation of the war crisis for the achievement of National Freedom...this is the central task before the National Forces in the New period.)[১]

যুদ্ধের শুরু থেকেই বৃটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতাকামী জনগণের বিরুদ্ধে দমন ও পীড়ন নীতি অনুসরণ করতে লাগল। বৃটিশ পার্লামেন্ট একটি আইন পাশ করে ভারতের বড়লাটকে প্রায় ডিক্টেটরি ক্ষমতা দিল এবং এই আইনের বলে বড়লাট কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের গণ্ডী লঙ্ঘনের অধিকারী হলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারতরক্ষা আইন জারী করা হল এবং এই আইনের বলে সরকারের হাতে স্বেচ্ছাচারিতার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া হল। সরকার বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার থেকে শুরু করে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত সমস্ত রকম শাস্তি দেবার নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হল।

ইতিমধ্যে জাতীয় কংগ্রেস বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আর একবার আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা করল। চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারীর উদ্যোগে এই প্রস্তাব অগেকার তুলনায় অনেকটা নরম সুরে ভারতীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি এবং কেন্দ্রে একটি জাতীয় সরকার (সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি National Government) প্রতিষ্ঠার দাবী করা হল, এবং যদি এই দাবী পূরণ করা হয়, তবে ভারতের পক্ষ থেকে যুদ্ধে সমস্ত রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হল।[২] কিন্তু এরকম একটা নমনীয় প্রস্তাবও বৃটিশ সরকার মানতে চাইল না।

কিন্তু এই প্রস্তাব উপলক্ষ করে গান্ধীজীর সঙ্গে কংগ্রেসের বিচ্ছেদ ঘটে গেল। কংগ্রেসের তরফ থেকে যুদ্ধে সহযোগিতার অর্থ ছিল গান্ধীজীর অহিংসা নীতি ও শান্তিবাদের প্রত্যাখান। গান্ধীজী অহিংসা নীতি বিসর্জন দিয়ে যুদ্ধে সহযোগিতায় রাজী ছিলেন না। ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ব্যক্তিগত অর্থাৎ একক সত্যাগ্রহ (Individual Civil Disobedience) শুরু হল। দাবী ভারতের স্বাধীনতা। নেতৃবৃন্দসহ প্রায় ৩০ হাজার লোক এই আন্দোলনে যোগদানের অপরাধে কারারুদ্ধ হলেন।[৩]

গান্ধীজীর এই ধীরে চলো নীতি, অর্থাৎ একক সত্যাগ্রহ চরমপন্থী ও বামপন্থী উভয় পক্ষকেই প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ করল। উভয়পক্ষই চাইছিলেন ইংরেজদের এই বিপদের দিনেই তাদের উপর চরম আঘাত হেনে দেশের মুক্তি ঘটাতে। সমস্ত ভারতবর্ষেও এই সময় ইংরেজ বিরোধী হাওয়া তীব্র হয়ে উঠেছিল। ১৯৩৯ এর-২রা অক্টোবর বোম্বাইতে যে ঐতিহাসিক শ্রমিক ধর্মঘট হয় তাতে ৪০টি কারখানার প্রায় ৯০ হাজার শ্রমিক যোগদান করেন। যুদ্ধের বিরুদ্ধে ডাকা এটাই ছিল ভারতীয় শ্রমিকদের দ্বারা প্রথম রাজনৈতিক ধর্মঘট। জামসেদপুরের বিখ্যাত টাটা কোম্পানীর শ্রমিকরাও যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ ধর্মঘট পালন করলেন। দেশের বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও যুবকরা মিলিত ভাবে

ভারতকে যুদ্ধের মধ্যে টেনে নেবার বিরুদ্ধে সরকারী নীতির প্রতিবাদ জানালেন। কম্যুনিষ্ট পার্টির তরফ থেকে জায়গায় জায়গায় মিছিল মিটিং ও ধরনার আয়োজন করা হল সরকারী যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য। প্রায় বিদ্রোহের সুরে কম্যুনিষ্ট পার্টিও দেশবাসীর কাছে আবেদন জানাল, যেন কোন ভাবেই ইংরেজ সরকারের এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে সাহায্য না করা হয়—'না একপাই, না একভাই' অর্থাৎ ভারতের এক কানাকড়ি কিংবা একজন ভারতীয় সৈনিক, কিছু দিয়েই যেন ইংরেজ সরকারের এই যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সহযোগিতা না করা হয়।[৪]

ইতিমধ্যে আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক, উভয় ক্ষেত্রেই সমস্ত প্রচলিত ধ্যান-ধারণায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে। ১৯৪১ সালের ১৮ই জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র গোপনে এবং ছদ্মবেশে তাঁর কলকাতাস্থ বাসভবন ত্যাগ করে প্রথমে পেশোয়ার এবং সেখান থেকে কাবুলে উপস্থিত হলেন। কাবুল থেকে তিনি ইতালীয় রাষ্ট্রদূতের সহায়তায় প্রথমে রাশিয়া এবং অবশেষে ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে জার্মানীতে উপস্থিত হলেন। অন্যদিকে ভারতের আর এক মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু জাপানে থেকে ভারতের বন্ধনমোচনের জন্য সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। ১৯২৪ সালে তিনি 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ' স্থাপন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই লীগ থেকেই ইতিহাস-বিখ্যাত আজাদ্-হিন্দ-ফৌজের (Indian National Army) উদ্ভব হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তখন বৃটেনের মান ইজ্জত ধূলোয় লুণ্ঠিত। জার্মানী ও জাপানীদের কাছে মার খেয়ে বৃটিশ সূর্য তখন প্রায় অস্তমিত হবার উপক্রম। ১৯৪১ সালের ১০ই ডিসেম্বর বৃটিশ নেভীর গৌরব 'প্রিন্স অব ওয়েলস্' এবং 'রিপালস্' নামক দুটি বিশাল যুদ্ধ জাহাজ জাপানী বোমারু বিমানের দুঃসাহসিক আক্রমণে সলিল সমাধি লাভ করল। এরপর ১১ই ডিসেম্বর গুয়াম দখল, ১২ই ডিসেম্বর ফিলিপিনের লুজানে অবতরণ, ১৬ই ডিসেম্বর বোর্ণিও দ্বীপে অবতরণ, ১৮ই ডিসেম্বর হংকং-এ অবতরণ, ২২শে ডিসেম্বর ওয়েক দ্বীপ দখল, ২৩শে ডিসেম্বর রেঙ্গুনে বোমা বর্ষণ, ২৫শে ডিসেম্বর হংকং-এ বৃটিশ ফৌজের আত্মসমর্পণ এবং ২৬শে ডিসেম্বর ম্যানিলাকে খোলা শহর বলে ঘোষণা[৫]—পরপর জাপানের এই দুঃসাহসিক কাণ্ড প্রশান্ত মহাসাগরে বৃটিশ সিংহকে যেন উলঙ্গ করে দিল।

যুদ্ধে ইংরেজদের এই ভরাডুবি মিত্রশক্তি মহলে যতই অসম্মান আর আশঙ্কার বাতাবরণ সৃষ্টি করুক না কেন, ভারতের জনগণ জাপানের হাতে ইংরেজদের এই মার খাওয়ার জন্য যার পর নাই খুশী হল। ঠিক এই সন্ধিক্ষণে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও চীনের তরফ থেকে ভারতের সঙ্গে আপোস মীমাংসার জন্য বৃটেনের উপর চাপ আসছিল। তাই ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ যখন জাপানীদের হাতে রেঙ্গুনের পতন ঘটল, তখন হঠাৎ ১১ই মার্চ বৃটিশ সরকার ভারতের জন্য 'ক্রীপস্ মিশন' ঘোষণা করল।

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ বৃটেনের একজন বামপন্থী নেতা বলে পরিচিত ছিলেন। তাই

২২শে মার্চ, ১৯৪২, যখন তিনি বৃটেন থেকে বৃটিশ যুদ্ধ মন্ত্রীসভার প্রস্তাব নিয়ে ভারতবর্ষে পৌঁছলেন, তখন স্বাভাবিকভাবে এ দেশের রাজনৈতিক মহলে কিছুটা আশার সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু দ্রুতই সবার মোহভঙ্গ হল। ১০-১১ই এপ্রিল কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি ক্রীপসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। ঐ বছরই ৭ই এবং ৮ই আগষ্ট বোম্বেতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় 'ভারত ছাড়ো' (Quit India) দাবী উত্থাপিত হল। জাতির আত্মসম্মান ও স্বাধীনতার দাবী জানিয়ে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস অহিংস গণ আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করল।

'অবিলম্বে ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান' দাবী করে বোম্বেতে প্রস্তাব গৃহীত হবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অর্থাৎ ৯ই আগষ্ট ভোরবেলায় ইংরেজ সরকার গান্ধী, নেহরু, আজাদ, প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি সমস্ত জাতীয় নেতাকে গ্রেপ্তার করল। একমাত্র বোম্বেতেই ১৪৮ জন ধৃত হলেন। কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত হল এবং সমগ্র ভারতে ব্যাপক ধরপাকড় ও দমননীতি প্রসারিত হল।

এদিকে সারা ভারতের পরিস্থিতি ইতিমধ্যে বিস্ফোরণের অবস্থায় পৌঁছেছিল। সুতরাং জাতীয় নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল যা ১৯৪২ সালের 'আগষ্ট বিপ্লব' নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। এই বিদ্রোহ ছিল সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত, কেননা প্রথম সারির সমস্ত নেতারাই ছিলেন কারা অন্তরালে। সরকার এই আন্দোলন দমন করার জন্য আরণ্যক বর্বরতার আশ্রয় নিয়েছিল। সারা ভারতে পুলিশ ও মিলিটারিকে যদৃচ্ছা মানুষ মেরে বিদ্রোহ দমন করতে বলা হল। জহরলাল নেহরুর মতে পুলিশ ও মিলিটারির গুলিতে ১০ হাজার ভারতীয় নিহত হয়েছিল।[৬] গ্রেপ্তারী, আটক ও হতাহত ছাড়া অন্যভাবেও অত্যাচারের বান ডাকানো হয়েছিল। জায়গায় জায়গায় কংগ্রেসের দপ্তর ও ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কমন্স সভায় ভারত সচিব মিঃ আমেরী স্বীকার করেছিলেন যে ভারতীয় জনসাধারণের উপর ৯০ লক্ষ টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য করা হয়েছিল এবং তার মধ্যে ৭৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আদায় করা হয়েছিল।[৭]

এইভাবে, একদিকে যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ত্রাসনীতির বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবর্ষ উত্তাল এবং সরকার অত্যাচারের জগদ্দল পাথরের কঠিন নিষ্পেষণে ভারতবাসীদের পিষে মারছে, ঠিক তখনই দেশের ইংরেজ সরকারের সঙ্গে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পর্ক অন্যদিকে মোড় নিল। এতদিন যে যুদ্ধ তাঁদের দৃষ্টিতে ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের ঘৃণ্য যুদ্ধ, এখন সেই যুদ্ধ তাঁদের কাছে হঠাৎ একেবারে 'জনযুদ্ধে'র মূর্তি ধারণ করে পরাধীন ভারতবর্ষে আবির্ভূত হল। ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে সরকার কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের উপর থেকে সমস্ত গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তুলে নিল। ২৪শে জুলাই কম্যুনিষ্ট পার্টি, তাদের শাখা সংগঠনগুলি এবং প্রকাশনের উপর থেকে সমস্ত রকম বাধানিষেধ তুলে নেওয়া হল।[৮]

কিন্তু হঠাৎ কম্যুনিষ্ট পার্টি এভাবে তাদের ভোল পাল্টে ফেলল কেন? কিংবা বৃটিশ সরকারই বা কেন হঠাৎ কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর সদয় হয়ে উঠল? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের তৎকালীন আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির ভূমিকা একটু আলোচনা করতে হবে।

১৮৬৪ সালে কার্লমার্ক্স "International Workingmens' Association" বা 'প্রথম আন্তর্জাতিক' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত বিশ্বে, বিশেষত শিল্পোন্নত ইউরোপ ও আমেরিকায় কম্যুনিষ্ট বিপ্লবকে ছড়িয়ে দেওয়া। সংগঠনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এঙ্গেলস্ বলেছিলেন, 'To weld together in one huge army the whole militant working class of Europe and America.'[৯]

সমস্ত বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য যে 'আন্তর্জাতিক'-এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, কালক্রমে তাই হয়ে দাঁড়াল বিদেশে রাশিয়ার বিদেশনীতির সপক্ষে জনমত সংগঠিত করার এক প্রধান হাতিয়ার। প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ হওয়ার সুবাদে রাশিয়া স্বাভাবিক ভাবেই 'কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিক'-এর সমস্ত দায়িত্ব ও নেতৃত্ব পেয়েছিল। রাশিয়া চাইছিল এই 'আন্তর্জাতিক' (কমিণ্টার্ন)-কে মাধ্যম করে বিশ্বের অন্যান্য দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলিকে তার তাঁবেদারে পরিণত করতে, যাতে পার্টিগুলো নিজেদের দেশে রাশিয়ার বৈদেশিক নীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই প্রসঙ্গে যোশেফ স্ট্যালিনের সেই বিখ্যাত উক্তির কথা স্মরণ করা যেতে পারে যেখানে তিনি তাঁর স্বভাবদুষ্ট উদ্ধত ভাষায় জানিয়েছিলেন, বিশ্ববিপ্লবের স্বার্থ এবং রাশিয়ার স্বার্থকে সমার্থক বলে যে বিনা প্রশ্নে, আন্তরিকভাবে ও প্রকাশ্যে মেনে নেবে, একমাত্র সে-ই কম্যুনিষ্ট সংজ্ঞার উপযুক্ত। (Communist is defined as one who unevasively, unconditionally, openly and heartily regards the cause of world revolution synonymous with the interest and defence of the U.S.S.R.)

কি অদ্ভুত ব্যাখ্যা! রাশিয়ার স্বার্থের ধারক বাহক না হলে কম্যুনিষ্ট পদবাচ্য হওয়ার সম্মান লাভ করা যাবে না। রাশিয়া কোন ভাবেই চাইছিল না বিশ্বের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলো নিজ নিজ দেশে কোন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করুক। এমন কি রাশিয়ার প্রত্যক্ষ মদত ছাড়া কম্যুনিষ্টরা কোনো দেশে ক্ষমতায় আসুক, স্ট্যালিন এটাও চাইছিলেন না। বরং কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলো রাশিয়ার স্বার্থবাহী হয়ে নিজেদের দেশে রাশিয়ার প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করুক, এটাই ছিল মস্কোর মনোগত ইচ্ছা।

১৯২৭-১৯৩৩ সালে হিটলার এবং তাঁর নাৎসী পার্টি যখন ধীরে ধীরে ক্ষমতার শীর্ষে উঠে আসছিলেন তখন কমিণ্টার্ন (কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিক) এক রহস্যময় ভূমিকা পালন করেছিল। কমিণ্টার্ন থেকে জার্মান কম্যুনিষ্ট পার্টিকে হিটলার এবং তাঁর নাৎসী বাহিনীর বিরোধিতা না করে জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের বিরোধিতা করতে বলা হয়েছিল। আসলে স্ট্যালিন চাইছিলেন না জার্মানীতে কম্যুনিষ্টরা ক্ষমতায় এসে রাশিয়ার

একাধিপত্যের অবসান ঘটাক। এমনকি রাশিয়ার গুপ্ত পুলিশ NKVD-র সাহায্যে কম্যুনিষ্ট পার্টির সমস্ত পলিটব্যুরো মেম্বারকে হত্যা করা হয়েছিল। জার্মান কম্যুনিষ্ট পার্টি সম্বন্ধে তাঁর মূল্যায়ন স্ট্যালিন ব্যক্ত করেছিলেন এইভাবে, 'If today in Germany the power, so to speak, falls and the communists seize hold of it, they will fall with a crash.'[১০]

এছাড়াও অস্ট্রিয়ার যে সমস্ত কম্যুনিষ্ট নেতা নাৎসীদের ভয়ে রাশিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁদেরও মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। রুশ সরকার জার্মান গুপ্ত পুলিশ গেস্টাপোদের হাতে তাঁদের তুলে দিয়েছিল।

স্ট্যালিন জানতেন রাশিয়ার সামাজ্য বিস্তারের প্রধান বাধা ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স। অতীতে জারের আমলেও এই ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সই বারবার বৃহত্তর রাশিয়া গঠনের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়েছিল। অতএব ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের ক্ষমতা না কমলে বৃহত্তর রাশিয়া (Greater Russia) গড়ে তোলা সম্ভব নয়। স্ট্যালিন এখানে এক ঢিলেই দুই পাখী মারতে চেষ্টা করলেন। তিনি জানতেন জার্মানী ভার্সাই চুক্তির প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর। সুতরাং জার্মানীর সাথে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে চুক্তি করে ইউরোপকে নিজেদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে নেওয়াও অনেক সহজ। তাই স্ট্যালিন কোনভাবেই চাইছিলেন না জার্মানীতে অন্য কেউ হিটলারের প্রতি চ্যালেঞ্জস্বরূপ হয়ে উঠুক।

১৯৩৯-এর ১৮ই মার্চ পার্টির ১৮-তম কংগ্রেসে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তাই স্ট্যালিন 'শান্তিকামী' জার্মানী ও রাশিয়ার জনসাধারণকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যেন তারা কোনভাবেই সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তের শিকার হয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে।[১১] এমনকি ইহুদী বিদ্বেষী হিটলারকে খুশী করবার জন্য স্ট্যালিন তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিটনভকে সরিয়ে মলোটভকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। লিটনভের একমাত্র দোষ ছিল, তিনি জন্মসূত্রে ইহুদী।[১২]

১৯৩৯ সালের ২৩-শে আগষ্ট বিশ্বকে হতবাক করে দিয়ে ফ্যাসিস্ট নাৎসী জার্মানী ও সমাজতন্ত্রী রাশিয়ার মধ্যে আনাক্রমণ চুক্তি (Non Aggression Treaty) স্বাক্ষরিত হল। চুক্তির শর্ত ছিল জার্মানী বা রাশিয়া কোন আবস্থাতেই নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বাধাবে না। কিন্তু এই চুক্তির মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ যে অংশ ছিল তা হল, **'সিক্রেট প্রোটোকল।'** এই সিক্রেট প্রোটোকলের গোপন শর্তগুলো সেদিন অবশ্য পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৮ সালে প্রথম সেই তথ্য প্রকাশিত হয়। রুশ জার্মান চুক্তির এই গোপনীয় অংশে দেখা যায় যে, বাল্টিক রাজ্যগুলি (ফিনল্যাণ্ড, এস্তোনিয়া, লাটাভিয়া ও বাসারাভিয়া) এবং পোলাণ্ডের পূর্ব অংশ 'জার্মান স্বার্থের বাইরে' এবং 'সোভিয়েট স্বার্থের অন্তগর্ত' বলে বিবেচনা করা হল। অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ও ফ্যাসিস্ট জার্মানীর মধ্যে পোলান্ডসহ পূর্ব ইউরোপের বেশ কিছু

অঞ্চল বাঁটোয়ারা হয়ে গেল।[১৩]

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানী পোলান্ড আক্রমণ করল। মাত্র ষোলদিন বাদে ১৭ই সেপ্টেম্বর রুশ সৈন্য পোলান্ডে প্রবেশ করল। ভাগ্যের পরিহাস, হতভাগ্য পোলান্ড যখন জার্মানীর আক্রমণে ছিন্ন-ভিন্ন তখন মস্কোর বলশয় থিয়েটারে জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপের সম্মানে বিখ্যাত 'Swam Lake' ব্যালে নাচের অনুষ্ঠান করা হচ্ছিল।[১৪]

পোলান্ড দখলের পরই জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে আরও একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। 'German Soviet Boundary and Friendship Treaty'-তে পোলান্ডে রুশ-জার্মান আগ্রাসন বিরোধী সমস্ত রকম বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছিল।[১৫] স্ট্যালিন পোলিশ কম্যুনিষ্ট পার্টিকে ভেঙ্গে দিলেন। রাশিয়ার আশ্রিত পোলিশ কম্যুনিষ্ট পার্টির সমস্ত নেতৃবৃন্দকে কুখ্যাত কাটিন (Katyn) বনাঞ্চলে হত্যা করা হল।[১৬]

শুধু তাই নয়। ১৯৩৯ সালে হতভাগ্য পোলান্ড জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে বাঁটোয়ারা হবার সময় কয়েক লক্ষ পোল রুশদের হাতে বন্দী হয়েছিল। পোলিশ সরকারের দাবী অনুসারে এদের মধ্যে কয়েক লক্ষ পোল সৈন্য, ১৫ হাজার অফিসার এবং ৮ শত ডাক্তার ছিলেন। কিন্তু এই মোট সংখ্যার মধ্যে মাত্র ৪ শত জন বন্দী ছাড়া আর কোন বন্দীর খোঁজ পাওয়া যায়নি।[১৭]

জার্মানী ও রাশিয়ার এই সাফল্য বর্ণনা করতে গিয়ে রাশিয়ার নব-নিযুক্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটভ ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে সুপ্রীম সোভিয়েতে এক ভাষণে বললেন, 'জার্মান বাহিনীর একটা আঘাত এবং সোভিয়েত বাহিনীর আর একটা, ভার্সাই সন্ধির এই নোংরা সৃষ্টি পোলান্ডকে মানচিত্র থেকে অবলুপ্ত করে দিয়েছে।'[১৮] শুধু এই বলেই ক্ষান্ত হলেন না মলোটভ। জার্মানীর বিরুদ্ধে বৃটেন ও ফ্রান্সের যুদ্ধ ঘোষণাকে বিদ্রূপ করে তিনি জানালেন, 'এখন জার্মানী শান্তির সপক্ষে, আর বৃটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধ চালিয়ে যাবার পক্ষপাতী।....সুতরাং হিটলারিজম্-কে ধ্বংস করার জন্য গণতন্ত্রের মিথ্যা ধ্বজা উড়িয়ে যুদ্ধ চালানো শুধুমাত্র নির্বোধের কাজ নয়, অপরাধও বটে।' (Now Germany stands for peace....It is therefore not only nonsensical but also criminal to persue a war for the destruction of Hitlerism under the bogus banner of a struggle for democracy...)[১৯]

ইতিমধ্যে সিক্রেট প্রোটোকল-এর শর্ত অনুসারে রাশিয়া এবং জার্মানী পোলান্ড থেকে নিজেদের হিস্সা অনুযায়ী সমস্ত কলকারখানা ও খনিজ দ্রব্য নিজেদের দেশে সরিয়ে নিতে শুরু করেছিল। ১৯৪০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর জার্মানী রাশিয়াকে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র পাঠিয়েছিল যার মধ্যে বিখ্যাত Luetzov শ্রেণীর যুদ্ধ জাহাজও ছিল। বিনিময়ে রাশিয়া জার্মানীকে দিল প্রচুর পরিমাণ খাদ্য, বস্ত্র, এবং কাঁচামাল।

১০ লক্ষ টন দানাশস্য, ৫ লক্ষ টন গম, ৯ লক্ষ টন পেট্রল, ১ লক্ষ টন তুলা, ৫ লক্ষ টন ফসফেট এবং প্রচুর পরিমাণে সয়াবীন ও অন্যান্য কাঁচামাল।[২০] সোভিয়েত লেখক পি ঝিলিনের হিসাব অনুসারে, রাশিয়া থেকে পাঠানো ১৯৪০ সালে এই সাহায্যের মূল্যমান প্রায় ৫৫ কোটি ৫৯ লক্ষ রুবল।

ফ্যাসিস্ট জার্মানী ও সোসালিষ্ট রাশিয়ার এই বন্ধুত্বের আদান-প্রদানের মধ্যে কোন ত্রুটি খুঁজে পেলেন না বিশ্বের কম্যুনিষ্ট নেতারা। বন্ধুত্বের এই উৎকর্ষতাকে সমর্থন করে মাও-সে-তুং বললেন, 'কিছু লোকের ধারণা যে সোভিয়েত ইউনিয়নের জার্মানীর সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের অর্থ জার্মানীর সপক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। কিন্তু বাণিজ্যিক সম্পর্ককে যুদ্ধে অংশগ্রহণ অথবা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা উচিৎ নয়।[২১]

সুতরাং বছরের পর বছর ধরে যে সমস্ত কম্যুনিষ্টরা নাৎসী অগ্রাসন ও যুদ্ধের সম্পর্কে সারা পৃথিবীর গগন বিদীর্ণ করছিলেন, তাঁরাই এবার রাতারাতি ভোল পাল্টে ফেললেন এবং তারস্বরে চেঁচাতে লাগলেন যে, রুশ-জার্মান চুক্তির ফলে যুদ্ধের সমস্ত বিপদ দূর হয়ে গেছে এবং বিশ্বের শান্তি সুনিশ্চিত হয়েছে। তাঁরা রুশ জার্মান সৈন্যবাহিনীর পোলান্ড দখলের মধ্যে কোন অন্যায় দেখতে পেলেন না। কম্যুনিষ্টরা এবার জার্মানীর সাথে মিত্র এবং বৃটেন ও ফ্রান্সের সাথে শত্রুর মত ব্যবহার করতে লাগলেন। মাও-সে-তুং এই চুক্তির হয়ে সাফাই গাইলেন, 'বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীকে উত্তেজিত করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করানো। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানী নিজেদের মধ্যে লড়াই করে নিজেদেরকে দুর্বল করবে, আর তার ফায়দা তুলবে মিত্রশক্তি—এই ছিল এই তিন দেশের মতলব। কিন্তু সোভিয়েত-জার্মান 'অনাক্রমণ চুক্তি' এই উদ্দেশ্যকে বানচাল করে দিয়েছে।'[২২]

এমনকি রুশ-জার্মান সৈন্যবাহিনীর পোলান্ড দখলকে স্বাগত জানিয়ে বিপ্লবের প্রেরণা স্বয়ং মাও-সে-তুং বললেন, 'পোলিশ সরকারের প্রতি কোনো সহানুভূতি দেখানো আমাদের পক্ষে ভুল হবে। কারণ সোভিয়েত ইউনিয়ন কেবলমাত্র তার হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের জন্য, শোষিত বায়লোরুশিয়ান ও ইউক্রেনিয়ানদের মুক্ত করতে ও তাদের জার্মান শোষণ থেকে রক্ষা করতেই এই কাজ করেছে।[২৩]

আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের অংশ হিসাবে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির ও রাশিয়ার এই ভূমিকা সমর্থন না করে উপায় ছিল না। সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি রাশিয়া ছিল সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে। কেননা কমিন্টার্নের (কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিক) প্রধান যোশেফ ষ্ট্যালিন স্বয়ং জানিয়ে দিয়েছিলেন, রাশিয়ার স্বার্থই পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ এবং কোন কারণেই রাশিয়ার বিরোধিতা করা অ-কম্যুনিষ্ট সুলভ আচরণ। ১৯২৭ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর-কমিন্টার্ণ থেকে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টিকে যে গোপন নির্দেশ পাঠানো হয়েছিল তাতে (Assembly Letter নামে খ্যাত) পরিষ্কার করে বলা হল,

'কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রশ্নাতীতভাবে কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিকের একটা অঙ্গ হবে। যে কোন কম্যুনিষ্ট পার্টিকেই বিশ্ব কম্যুনিষ্ট সংগঠনের সজীব অংশ (Organic Part) হতেই হবে। নচেৎ সেই পার্টি নিজেকে কম্যুনিষ্ট বলতে পারে না। বিশ্বব্যাপী সংগ্রামরত সংগঠনের এই নীতির মধ্যে যারা বিদেশী নিয়ন্ত্রণ (dictation) খোঁজার চেষ্টা করে, তারা আদৌ কম্যুনিষ্ট নয়।'[২৪]

অতএব ৩০-এর দশকে কম্যুনিষ্টরা এদেশে বৃটিশ শাসন অবসানের যে ডাক দিয়েছিলেন তার উদ্দেশ্য যতটা না ছিল ভারতের কোটি কোটি নিরন্ন জনসাধারণকে শোষণের হাত থেকে মুক্ত করা, তার থেকেও বেশী ছিল এদেশে রাশিয়ার স্বার্থ রক্ষা করা। কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রকাশিত ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৪১-এর ৫৫নং Party Letter-এও পরিষ্কার বলা হয়েছিল, 'স্বাধীনতার জন্য আমাদের লড়াই আরও তীব্রতর করতে হবে যাতে সোভিয়েত রাশিয়ার স্বার্থ রক্ষা করা যায়।' (We must fight harder for our freedom in order to defend the Soviet Union')।[২৫]

কিন্তু এটা দুঃখজনক হলেও সত্যি যে ১৯৩৪ সালের আগে পর্যন্ত কম্যুনিষ্টরা সরকার বিরোধী কোন জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেননি। এমনকি গান্ধীজীর ডাকে যখন দেশের আপামর জনতা বিদেশী বস্ত্র বর্জন করে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' মাথায় তুলে নিচ্ছিলেন, তখন এই কম্যুনিষ্টরাই ইংলন্ডের তৈরী কাপড়ের স্যুট পরে পৃথিবীর শ্রমিক ঐক্য শক্তিশালী করতে ব্রতী হয়েছিলেন। 'যখন স্বদেশী বস্ত্র ও দ্রব্যের প্রতি ভালবাসা সারা দেশকে আবেগে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন কম্যুনিষ্টরা বিদেশী কাপড়ে তৈরী স্যুট পরে ল্যাঙ্কাশায়ারের বৃটিশ শ্রমিকদের সঙ্গে তাঁদের ঐক্য প্রদর্শন করছিলেন।'[২৬] সরোজ মুখার্জীর লেখাতেও আমরা দেখি যে তিনি যখন প্রথম কম্যুনিষ্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন, তখন নেতাদের লাল টাই দেখে তিনি নাকি খুবই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন ও ভেবেছিলেন যে একজন প্রকৃত কম্যুনিষ্ট হতে গেলে এই ধরণের পোষাক পরতে হয়।

কম্যুনিষ্টরা জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেননি, কারণ গান্ধী তথা কংগ্রেস পরিচালিত সরকার বিরোধী এই আন্দোলন রাশিয়ার চোখে ছিল 'শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ বিরোধী আন্দোলন।' ১৯২০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে মস্কোয় অনুষ্ঠিত প্রথম 'World Congress-এ 'The Programme of Communist International' প্রস্তাবে বলা হয়েছিল 'গান্ধীবাদ ক্রমে ক্রমেই এমন এক আদর্শে পরিণত হচ্ছে যা গণবিপ্লবের সম্পূর্ণ বিরোধী। সুতরাং কমিউনিজম্ দ্বারা একে দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করতে হবে।'[২৭]

১৯২৮ সালে মস্কোয় অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক-এ একটি প্রস্তাবে বলা হল, 'কম্যুনিষ্টদের অবশ্য করণীয় কাজ হল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সংস্কারপন্থার মুখোস খুলে দেওয়া এবং স্বরাজী, গান্ধীবাদী প্রভৃতিদের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সমস্ত রকম ধাপ্পাবাজিকে প্রতিহত করা।'[২৮]

অতএব গান্ধী এবং কংগ্রেসের মুখোস খুলে দেওয়ার জন্য কম্যুনিষ্ট পার্টিকে আরো লাগাতার কার্যক্রমের নির্দেশ দেওয়া হল। কারণ 'প্রাভদা'র ভাষায়, 'ভারতের মহান জনগণ যে এখনও জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি মোহমুক্ত হয়নি, সেটাই ভারতে বিপ্লবের বিজয়ের পথে অন্যতম বড় বাধা।'[২৯] এবং এই বিশাল সংখ্যক মানুষকে কংগ্রেসের মোহ ভঙ্গ করার প্রয়োজনে পার্টিকে শ্রমিক কৃষকদের সংগঠিত করতে বলা হয়েছিল।

অবশ্য ইতিমধ্যে কম্যুনিষ্টরা ভারতের ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেছেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনে তাঁদের সাংগঠনিক প্রতিভারও স্বাক্ষর রাখতে পেরেছিলেন। ১৯২৮-১৯২৯, এই এক বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে কলকারখানায় শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করেছিলেন এবং এর নেতৃত্বে ছিলেন কম্যুনিষ্টরা। কিন্তু ইংরেজ সরকারের দমন নীতি এবং সরকার কর্তৃক ৩১জন বিশিষ্ট কম্যুনিষ্ট নেতা গ্রেপ্তার হবার সাথে সাথেই কম্যুনিষ্টদের কাজকর্মে ভাঁটা পড়তে শুরু করে। ফিলিপ স্প্রাট, বেন ব্রাডলে, মুজফ্ফর আহ্‌মেদ প্রভৃতি প্রথম সারির কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হন। কিন্তু দুঃখজনক ঘটনা, এখানে কম্যুনিষ্টরা যতটা ভারতের শ্রমিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে চাইছিলেন, তার থেকেও বেশী চাইছিলেন রাশিয়ার নির্দেশ পালন করে নিজেদের সাচ্চা কম্যুনিষ্ট বলে প্রতিপন্ন করতে। মামলায় (যা মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা নামে ভারতের ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে) জানা যায় যে, এই আন্দোলনের পরিকল্পনা, তাত্ত্বিক ও আর্থিক সাহায্য, সবই হয়েছিল রাশিয়ার তরফ থেকে। বৃটিশ গোয়েন্দা দফতরের রিপোর্ট থেকেও জানা যায়, 'মস্কো থেকে এই সংস্থাগুলোকে (কম্যুনিষ্ট সংগঠন) আর্থিক সাহায্য দেওয়া হত। গোপন ভাবে এবং ষড়যন্ত্রমূলক উপায়ে মস্কো থেকে সরাসরি অথবা ইউরোপের মাধ্যমে এই সমস্ত সংস্থাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা হত।'[৩০]

মীরাটের ব্যর্থতা ভারতের কম্যুনিষ্টদের দূর্বলতাগুলো যেন সবার সামনে তুলে ধরেছিল। ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধী বা কংগ্রেস কিংবা অন্যান্য জাতীয় সংগঠনগুলোকে বাদ দিয়ে কম্যুনিজমের প্রভাব বৃদ্ধি সম্ভব নয়, দেরিতে হলেও এই বোধটা এবার কম্যুনিষ্ট তাত্ত্বিকদের হয়েছিল। তাই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এবার কম্যুনিষ্টরা জাতীয় আন্দোলনে সামিল হলেন। জাতীয় আন্দোলনে নিজেদের ভূমিকা পালন করার জন্য তাঁরা কংগ্রেস ও কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টিগুলিতে যোগদান করলেন। কিন্তু দূর্ভাগ্য এখানেও, এবারও কম্যুনিষ্টদের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল রাশিয়ার স্বার্থ রক্ষায় কংগ্রেস ও কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টির মধ্যে ভাঙ্গন ধরিয়ে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করা।

'ত্রিশের দশকের শেষের দিকে কম্যুনিষ্টরা যখন কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত—এই বিশ্বাস থেকে তাঁরা সেটা করেন নি। অকম্যুনিষ্ট দলগুলিকে কব্জা করে অথবা তাদের সঙ্গে আঁতাত করে ফ্যাসিজিমের

বিরুদ্ধে লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া—এটা ছিল তাঁদের বিশ্বব্যাপী রণকৌশলের অঙ্গ। এই কৌশল অনুসারেই তাঁরা কংগ্রেসের ভিতর থেকে কংগ্রেস সোসালিষ্টদের কব্জা করার চেষ্টা করেছিলেন।'[৩১]

জয়প্রকাশ নারায়ণের অভিজ্ঞতাতেও : The communists had nothing undone to destroy the unity within CSP[৩২]।

কিন্তু এবার কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর সরকারের কঠিনতম আঘাতটি নেমে এল। যে উদ্দেশ্যে সরকার এতদিন পর্যন্ত এদেশে কম্যুনিষ্টদের কার্যকলাপ বিস্তারে আগ্রহী ছিল ('মীরাট মামলা' প্রচারের জন্য সরকার ১,৬০,০০০ পাউন্ড খরচ পর্যন্ত করেছিল) হঠাৎ তারাই জাতীয় আন্দোলনের main-stream-এ যোগদান করবে, এটা নিশ্চয়ই বরদাস্ত করা যায় না। ১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে সরকার কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করল।

এদিকে ১৯৩৫ সালের আগষ্ট মাসে মস্কোয় অনুষ্ঠিত সপ্তম আন্তর্জাতিকে 'The Revolutionary movement in the colonial countries' (1935) প্রস্তাবে চৈনিক প্রতিনিধি ওয়াং মিং (Wang Ming) ভারতের কম্যুনিষ্টদের জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেননা, 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, জাতীয় বিপ্লবী দল এবং এদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্কারমূলক সংস্থাগুলির ভিতর থেকে কাজ করাকে অবহেলা করা কোন মতেই ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের পক্ষে উচিত হবে না।'[৩৩] অবশ্য কমিন্টার্নের এই বাস্তববুদ্ধিসঞ্জাত নির্দেশ না দিয়ে উপায়ও ছিল না। তথাকথিত অতি বাম (ultra left) নীতি কম্যুনিষ্টদের যে শুধু জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল তাই নয়, সংগঠনের অবস্থাও এমন করুণ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল যে, ১৯৩৪ সালে পার্টির সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৫০ জন মাত্র।[৩৪]

১৯৪১ সালের ২২শে জুন হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করলেন। জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করতে পারে এই অবিশ্বাস্য ঘটনায় কম্যুনিষ্টদের মধ্যে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত বিহ্বলতার সৃষ্টি হল। শান্তিকামী জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করতে পারে একথা কম্যুনিষ্টরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কেননা ১৯৩৯ সালে রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর এই কম্যুনিষ্টরাই যুদ্ধের সমস্ত ঘটনা-দুর্ঘটনার জন্য বৃটেন ও ফ্রান্সের বুর্জুয়াদের দায়ী করে আসছিলেন। রাশিয়াও জার্মানীকে এতদিন নির্দোষ বলে সার্টিফিকেট দিয়ে আসছিল। এমনকি ১৯৪০ সালের ৩০ শে নভেম্বর 'প্রভদা'য় স্টালিনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছিল : জার্মানী, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড আক্রমণ করেনি, বরং ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড জার্মানীকে আক্রমণ করেছে। অতএব বর্তমান যুদ্ধের দায়িত্ব তাদের।

রাশিয়া কী সুচারুভাবে বিশ্বের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলোর উপর তার তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং সেগুলোকে নিজের বিদেশ-নীতি রূপায়ণ করার সবচেয়ে

বিশ্বস্ত যন্ত্রে পরিণত করেছিল, তা তৎকালীন কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলোর নেওয়া 'লাইন' বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়।

ফ্রান্স, ও ইংল্যান্ডের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলো রুশ-জার্মান চুক্তিকে যে শুধু স্বাগত জানিয়েছিল তাই নয়, পোলাণ্ডে রুশ-জার্মান আক্রমণের মধ্যেও তাঁরা শান্তির প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। এমনকি রাশিয়ার বন্ধু জার্মানী যখন ফ্রান্স আক্রমণ করেছিলেন তখন ফ্রান্সের কম্যুনিষ্ট পার্টির তরফ থেকে দেশবাসীকে জার্মান আগ্রাসী সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার ডাক দেওয়া হয়নি, বরং বলা হয়েছিল, 'এ যুদ্ধ আমাদের নয়। এ হচ্ছে দুটি গুণ্ডা দলের মধ্যে লড়াই, একদিকে বৃটিশ-ফ্রান্স গোষ্ঠী এবং অন্যদিকে হিটলারের দল। আমরা এর বাইরে থাকব।'[৩৫]

ইংল্যান্ডের কম্যুনিষ্ট পার্টিও অনুরূপভাবে রুশ পররাষ্ট্রনীতির স্বার্থবাহী ' লাইন' আঁকড়ে ধরে থাকলেন। এখানেও কম্যুনিষ্টরা বৃটেন, ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে এই 'সাম্রাজ্যবাদী'যুদ্ধের কোন গুণগত তফাৎ খুঁজে পেলেন না। তাঁদের কাছে প্রধান শত্রু-বলে চিহ্নিত হয়েছিল বৃটিশ ও ফরাসী পুঁজিপতি শ্রেণী।

এই অবস্থায় ভারতের কম্যুনিষ্টদের অবস্থা ছিল আরো সঙ্কটজনক। রণাঙ্গন থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে থাকার জন্য এখানে কম্যুনিষ্টরা কিছুতেই যুদ্ধের পরিবর্তিত পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করতে পারছিলেন না। জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করতে পারে, এই অবিশ্বাস্য ঘটনা তাঁদের সম্পূর্ণ বোকা বানিয়ে দিয়েছিল। কিছুদিন আগে তাঁরাই রুশ-জার্মান চুক্তিকে শান্তির সপক্ষে এক মহান পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেছিলেন এবং হতাশাগ্রস্ত ইংরেজরা শান্তির এই মহান প্রচেষ্টাকে বানচাল করতে চাইছে বলেও অভিযোগ করেছিলেন। ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী পূর্ণচন্দ্র যোশী এই যুদ্ধের জন্য ইংরেজদের তীব্র সমালোচনা করে এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করাতে বৃটিশ প্রতিক্রিয়াশীলরা এতই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে যে তারা সঙ্গে সঙ্গে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিল।'[৩৬]

যাইহোক, রাশিয়া আক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বৃটিশ কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রধান হ্যারি পলিট এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যুদ্ধ সম্পর্কে কম্যুনিষ্টদের নূতন করে চিন্তা-ভাবনার জন্য আবেদন জানালেন। পলিটের বিবৃতি ভারতের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছিল।

জার্মানী দ্বারা রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার ফলে তার এতদিনকার জার্মানী-পিরীতে ছেদ পড়ল। যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। ১৯৪১-এর ১২ই জুলাই রাশিয়া এবং ইংল্যাণ্ডের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী জার্মানীর বিরুদ্ধে উভয় দেশই এক সাথে যুদ্ধ করতে রাজী হয়েছিল। এবার 'সাম্রাজ্যবাদী war monger' বৃটেন (বৃটেন সম্বন্ধে এটাই ছিল কম্যুনিষ্টদের দৃষ্টিভঙ্গী) সমাজতন্ত্রের পিতৃভূমী রাশিয়ার সাথে কিভাবে চুক্তিবদ্ধ হতে পারে তা কম্যুনিষ্টদের বোধগম্য হচ্ছিল না।

কিন্তু জার্মানী দ্বারা রাশিয়া আক্রমণ, অ্যাংলো-রুশ চুক্তি এবং সর্বোপরি হ্যারি পলিট ঘোষিত নতুন 'জনযুদ্ধ' লাইন ভারতের কম্যুনিষ্টদের চিন্তা-ভাবনায় বিশেষ পরিবর্তন আনতে পারল না। তাঁরা তাঁদের পুরানো 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের' লাইনই অনুসরণ করতে থাকলেন। এমনকি ১৯৪১ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত ৪৪ নং পার্টি লেটারেও (Party Letter) পরিষ্কার বলা হল, 'The war still an imperialist war as far as imperialist Britain and Nazi Germany are concerned.'[৩৭]

কিন্তু ওই বছরই অক্টোবর-নভেম্বর মাস থেকে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি তাদের 'লাইন' পরিবর্তন করতে থাকে। এতদিনের 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' এবার তাদের কাছে হাজির হল 'জনযুদ্ধে'র রূপ নিয়ে। ইংরেজ সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরোধিতার পরিবর্তে তাদের সহযোগিতা করাই এখন হয়ে দাঁড়াল কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রধান কর্তব্য।

কিন্তু মাত্র কিছুদিন আগেই ভারতের জনসাধারণকে আশু কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়ে বিশিষ্ট নেতা পি সুন্দরায়া পার্টির মুখপত্রে (National Front) লিখেছিলেন, 'ভারতবর্ষে আমাদের সামনে প্রাথমিক ইস্যু ফ্যাসিজিমের বিরুদ্ধে লড়াই নয়, বরং দেশে একটা প্রকৃত গণতন্ত্রের জন্যই আমাদেরকে এখন লড়তে হবে।'[৩৮]

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪১, ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি পি সি যোশী ভারত সরকারের 'হোম মেম্বার' স্যার রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েলের সাথে যোগাযোগ করলেন। পার্টির তরফ থেকে ম্যাক্সওয়েলকে জানানো হয়েছিল যে, সরকারের এই যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সর্বতোভাবে পার্টির তরফ থেকে সমর্থন জানান হবে এবং এই সমর্থন হবে কোনরকম পূর্ব শর্ত ছাড়াই (Unconditional Support)। জেলে বন্দী পার্টির সমস্ত সদস্যকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হল, কারণ আসন্ন সর্বভারতীয় কংগ্রেসের বৈঠকে উত্থাপিত স্বাধীনতা বিষয়ক যে কোন প্রস্তাব বানচাল করতে এই মুক্ত কমরেডদের প্রয়োজন। যোশী ম্যাক্সওয়েলকে লিখেছিলেন,Release them (The Communist Prisoners) and you will see that their support will indeed be Unconditional.[৩৯]

এক নতুন তত্ত্ব দাঁড় করানো হল কম্যুনিষ্ট পার্টির তরফ থেকে। ১৯৪১-এর ডিসেম্বরে রণদিভে লিখলেন, 'প্রোলেতারিয় আন্তর্জাতিকতাবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রায় এগারো বছর আগেই শুরু হয়ে গেছে। 'কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিকে'র ষষ্ঠ এবং সপ্তম—উভয় কংগ্রেসেই অত্যন্ত যুক্তিসংগতভাবেই বলা হয়েছে যে সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা করাই হল আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রকৃত পরীক্ষা'(Defence of Soviet Union was the acid test of internationalsim)[৪০]

লক্ষ্য করার বিষয়, রাশিয়া আক্রান্ত হবার সাথে সাথে কিন্তু এখানে কম্যুনিষ্টরা তাঁদের 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ'কে 'জনযুদ্ধে' রূপান্তরিত করেননি। রাশিয়া আক্রান্ত হয়েছিল ১৯৪১ সালের ২২শে জুন, ইঙ্গ-রুশ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১২ই জুলাই ১৯৪১। কিন্তু এখানে

কম্যুনিষ্টদের যুদ্ধ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাতে থাকে অক্টোবর মাস থেকে। ডিসেম্বরে 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ'কে 'জনযুদ্ধে' পরিণত করার ডাক দেওয়া হয়েছিল।

জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করার সাথে সাথেই বৃটিশ কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রধান হ্যারি পলিট চলমান সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের লাইন পরিবর্তন করতে আহ্বান করেছিলেন। তা আমরা আগেই দেখেছি। কিন্তু পলিটের এই আহ্বান আদৌ বৃটিশ গোয়েন্দা পুলিশের একটা চাল কিনা, ভারতের কম্যুনিষ্টরা ঐ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না। এছাড়া পলিটের চরম প্রতিদ্বন্দ্বী রজনী পাম দত্ত আদৌ জনযুদ্ধ লাইনের সপক্ষে ছিলেন না। ফলে স্বাভাবিক কারণেই এখানে কম্যুনিষ্টরা এক অদ্ভুত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ, যা ভারতের কম্যুনিষ্টদের দীর্ঘ এই পাঁচ মাস পুরানো 'লাইন' আঁকড়ে ধরে থাকতে বাধ্য করেছিল, তা হল এই যে, রাশিয়া থেকে কম্যুনিষ্টরা কোন নির্দেশ পাচ্ছিলেন না। যদিও কম্যুনিষ্টরা এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, ভারতের জনসাধারণের স্বার্থে বাধ্য হয়েই তাঁরা তাঁদের 'লাইন' পরিবর্তন করেছিলেন। কিন্তু এখানেও যে কম্যুনিষ্টরা কতবড় মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন তা বৃটিশ গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকেই জানা যায়। 'এখনও পর্যন্ত কমিন্টার্ন-এর কোন নির্দেশ ভারতে এসে পৌঁছায়নি। সাধারণভাবে কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির নীতি নির্ধারণের জন্য কমিন্টার্নের পক্ষ থেকে সরকারীভাবে কোন ঘোষণাও করা হয়নি। যে কোনো রকমের অধিকৃত নির্দেশের জন্য এখানকার কম্যুনিষ্ট নেতারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।'[৪১]

কিন্তু রাশিয়ার পক্ষে তখন নির্দেশ পাঠানোর কোন প্রশ্নই ছিল না। জার্মান আক্রমণের প্রচণ্ডতায় রাশিয়ার নিজেরই তখন নাভিশ্বাস ওঠার যোগাড়। নাৎসী আক্রমণ রাশিয়াকে এভাবে demoralised করে দিয়েছিল যে মস্কোয় আশ্রিত তাবড় তাবড় কম্যুনিষ্ট নেতারা পর্যন্ত ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিলেন। বিদেশী কম্যুনিষ্ট নেতাদেরও কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। এমনকি তাঁরা মস্কোতে ছিলেন কিনা তাও বোঝা যাচ্ছিল না।[৪২]

আক্রমণের আকস্মিকতা এবং প্রচণ্ডতা স্ট্যালিনকে এমন বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল যে আক্রান্ত হবার পর প্রথম এগারো দিন তিনি যুদ্ধ সম্পর্কে কোন বিবৃতি পর্য্যন্ত দেননি। এগারো দিনের এই দীর্ঘ এবং অবিশ্বাস্য প্রতীক্ষার পর, অবশেষে ৩-রা জুলাই মস্কো রেডিও থেকে তিনি জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রথম বক্তব্য রাখেন। এখানে উল্লেখ্য, স্ট্যালিন যতটা সম্ভব মৃদু ভাষাতেই জার্মানীর এই আক্রমণের নিন্দা করেছিলেন। জার্মানীর সাথে মিলেমিশে ইউরোপ ভাগের যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন এত সহজে তিনি সেটা নষ্ট হতে দিতে চাইছিলেন না। কম্যুনিষ্ট মহল থেকে জার্মানীর এই আক্রমণ বৃটেন এবং আমেরিকার পুঁজিপতি শ্রেণীর চক্রান্ত বলে বর্ণনা করা হল। শান্তিপ্রিয় জার্মানী বন্ধু রাশিয়াকে আক্রমণ করতে পারে এরকম একটা অনুপযুক্ত ঘটনা কিছুতেই তাঁরা সরল মনে মেনে

নিতে পারছিলেন না। তাঁদের আশা ছিল হিটলার নিজের ভুল বুঝতে পেরে রাশিয়ার সঙ্গে শীঘ্রই যুদ্ধের অবসান ঘটাবেন। এমন কি তাঁরা এও বললেন যে হিটলারের সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ আন্তর্জাতিক আর্থিক পুঁজিবাদের চক্রান্ত। (Hitler's invasion of the Soviet Union was a conspiracy of international finance capital)।[৮৩] সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার বন্ধু শান্তিপ্রিয় জার্মানী নিশ্চয়ই 'International finance capital'-এর চক্রান্ত বুঝতে পারবে, এরকম একটা আশা স্ট্যালিন পোষণ করছিলেন।

ইতিমধ্যে অবশ্য ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি গ্রেট বৃটেনের কম্যুনিষ্ট পার্টির চাপে পড়ে তাদের 'লাইন' কিছুটা পরিবর্তন করেছিলেন, কিন্তু যাকে বলে ১৮০ ডিগ্রী ঘুরে যাওয়া, সে ভাবে যুদ্ধ সম্পর্কে নিজেদের এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনকে তাঁরা প্রকাশ করতে পারছিলেন না। এর জন্য তাঁদের আরো কিছু দিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ৬ই নভেম্বর, ১৯৪১, সোভিয়েত বিপ্লবের ২৪-তম বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্ট্যালিন বিশ্বের মেহনতী মানুষের জন্য যে ভাষণটি পড়েন তাতেই নিহিত ছিল এত দিনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে জনযুদ্ধে পরিণত করবার অমোঘ নির্দেশ। স্ট্যালিন বললেন, 'গ্রেট বৃটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আজ একসাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং আমরা মিলিতভাবে শপথ নিয়েছি মানবতার শত্রু নাৎসীবাদকে ধ্বংস করে মানব জাতিকে মুক্ত করবার।' শ্রেণী স্বার্থের এক নতুন তত্ত্ব খাড়া করে স্ট্যালিন দাবী করলেন, "ইংলন্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাথমিক গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাগুলি আছে ; ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিক সংগঠন এবং পার্লামেন্টও সেখানে বিরাজ করছে। কিন্তু হিটলারের জার্মানীতে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করা হয়েছে। সুতরাং সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের উচিত গ্রেট বৃটেন, আমেরিকা ও আমাদের দেশের সৈন্যবাহিনীকে সমর্থন করা। কারণ তারা শুধু ইউরোপেই নয়, এশিয়াতেও মুক্তির অগ্রদূত।"[৮৪]

এতদিন পরে এবার কম্যুনিষ্টদের সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটল। রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথেই পার্টির যুদ্ধ সংক্রান্ত লাইন পরিবর্তন না করার জন্য নিজেদের আহম্মকিকে ধিক্কার জানানো হল। দীর্ঘ এই সাড়ে চার মাস সংকীর্ণ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের শিকার হয়ে ইংরেজ সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরোধিতা করার জন্য দুঃখও প্রকাশ করা হয়েছিল। হ্যারি পলিটকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো হল সঠিক পথ দেখানোর জন্য[৮৫]। ১৯৪১ সালের ১লা ডিসেম্বর প্রকাশিত ৫৪ নং 'পার্টি লেটারে' বলা হল, 'আমরা এতদিন ভুল করেছিলাম কারণ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের প্রতি আমাদের অন্ধ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ঘৃণা আমাদেরকে এই সহজ সত্য থেকে আড়াল করে রেখেছিল যে বৃটিশ সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে একই শিবিরে আছে এবং হিটলারের ফ্যাসিজিমের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।'

এবং কম্যুনিষ্টরা নিশ্চয় বেশীদিন ভুল পথের পথিক হতে পারেন না ! সুতরাং, দেউলি

পরে প্লেনারে তাঁরা প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, 'আমরা হলাম practical party। সুতরাং নতুন পরিস্থিতিতে আমাদের কাজ হবে, শুধু সংগ্রামের জন্য নতুন পদ্ধতি তৈরী করাই নয়, নতুন স্লোগানকেও ছড়িয়ে দেওয়া।' আর এই নতুন স্লোগান কি ? প্রস্তাবেই বলা হল, 'আমাদের পার্টির মূল স্লোগান (Key slogan) হল, ভারতীয় জনগণকে 'জনযুদ্ধে' উপযুক্ত ভূমিকা পালনের জন্য প্রস্তুত করা।'[৪৬]

১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারী পাটনাতে যে সারা ভারত ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে ৬০০-এর বেশী প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বিপুল ভোটাধিক্যে 'জনযুদ্ধ' নীতি গৃহীত হয়েছিল। মাত্র ৯ জন প্রতিনিধি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন।[৪৭]

অতএব দীর্ঘ দিনের 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' স্ট্যালিনের যাদুমন্ত্রে 'জনযুদ্ধে' রূপান্তরিত হয়ে গেল। পার্টির কর্মীদের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হল ইংরেজ সরকারের পক্ষে জনমত গঠন করার উদ্দেশ্যে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের থেকেও এখন স্বাধীনতা আন্দোলন দেশের পক্ষে বেশী ক্ষতিকারক বলে প্রতিভাত হল। কারণ ইংরেজ এখন রাশিয়ার বন্ধু (in the same camp with the Soviet Union)।

কম্যুনিষ্ট পার্টি ঘোষিত এই 'জনযুদ্ধে'র এক অনন্যসাধারণ ছবি এঁকেছিলেন সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ তাঁর 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসে। এই উপন্যাস সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি দেশ পত্রিকায় পরবর্তীকালে লিখেছেন, 'বৃটিশ শাসকীয় প্রভুত্ব তখন তূণীর থেকে প্রায় একশো আর্তনাদের বাণ বের করে ভারতীয় জনজীবনের ক্লিষ্ট কপালটাকে আরও ক্ষতাক্ত করে চলেছে।....(সরকার দ্বারা) ধান চাল অপসারিত করে বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণ প্রান্তের জেলায় জেলায় একটা দুঃসহ রিক্ততা সৃষ্টি করা হয়েছে। মুনাফাখোর এক শ্রেণীর দেশীয় ব্যবসায়ী সুযোগ বুঝে ধান চাল মজুত করে দরের ফাটকা খেলাতে মেতে উঠেছে। ধান চালের এই অবরোধের ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। জাতীয় কংগ্রেস বেআইনি বলে ঘোষিত ও নিষিদ্ধ হয়েছে। জাতির রাজনীতিক স্বাধীনতার দাবী করে সংগ্রাম করবার পরিকল্পনা করেছিলেন যাঁরা, জননেতা এবং আরও কয়েক লক্ষ কর্মীসাধারণ, তাঁরা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। বৃটিশরাজ বলেছেন এ সময় কেউ স্বাধীনতার দাবী কোর না। যুদ্ধপ্রচেষ্টায় মন প্রাণ ও অর্থ দিয়ে সাহায্য কর। এই সময় ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টিও বললেন, যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধা দিতে নেই, বরং স্বাধীনতার দাবী করে বৃটিশরাজকে বিড়ম্বিত করা উচিত নয়। ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা, যার সম্যক অর্থ হল সেদিনের স্বাধীনতার দাবী ও সংগ্রামের বিরোধিতা করা এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সাহায্য করবার জন্য একটি নৈষ্টিক আনুগত্যের তত্ত্ব প্রচার করা।'[৪৮]

২৫শে জানুয়ারী থেকে ১১ই মার্চ (১৯৪২), বিভিন্ন জেলে আটক কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ ইংরেজ সরকারকে মুচলেকা দিলেন যে, বৃটিশ সরকারের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী পালটে গেছে এবং তাঁদের মুক্তি দিলে সরকারই লাভবান হবে। এই সকল নেতৃবৃন্দের মধ্যে

কয়েকজন হলেন,—সুনীল মুখার্জী ও রাহুল সাংকৃত্যায়ন (হাজরীবাগ জেল) ; এ কে ঘোষ, আর ডি ভরদ্বাজ (বেরিলী সেন্ট্রাল জেল) ; সাজ্জাদ জাহীর (লক্ষ্মৌ সেন্ট্রাল জেল) ; এস এ ডাঙ্গে, এম জি পাটকর, বি টি রণদিভে (যারবেদা সেন্ট্রাল জেল) প্রভৃতি।[৪৯]

১৯৪২ সালের ২৩ এপ্রিল ইংরেজ সরকারকে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির তরফ থেকে এক গোপন স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল। এতে কম্যুনিষ্টদের তরফ থেকে সমস্ত রকম সরকারী বাধা নিষেধ তুলে নেবার আবেদন জানানো হল। সেই গোপন স্মারকলিপির কিছু অংশ এখানে তুলে দেওয়া হল।

CONFIDENTIAL
NOT FOR PUBLICATION
MEMORANDUM ON COMMUNIST POLICY AND
PLAN OF WORK

....We give below our demands on the Government, demands which we think enable us to do all we can to help to resist the Japs, to intensify the war efforts and win the support or our people for our policy and practice.

1. Unconditional release of all Communist prisoners and detenues.
2. Removal of restrictions on all Communists who have been interned, externed or otherwise restricted.
3. Withdrawal of warrants against all underground Communists.
4. Withdrawal of bans on the 'National Front', 'The New Age' and all other organs of the Communists.
5. Immediate grant of press declarations for new newspapers, journals and periodicals.[৫০]

এই Memorandum-এ আরও বলা হল, 'বর্তমান সরকারের সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক তফাৎ যাই থাক না কেন, আমরা এখন সরকারকে যুদ্ধ বাধানোর জন্য দোষারোপ করছি না, বরং আরও ভালভাবে যুদ্ধ না করার জন্য দোষারোপ করছি।... আমরা আশাকরি যা আমাদের রাজনৈতিক কর্তব্য, তা-ই সরকারের সেনাবাহিনীর বাস্তব প্রয়োজন সাধন করবে। (What to us is our political duty would also be a military practical necessity for the Government).

এই আবেদনে সাড়া দিয়ে ৩০শে এপ্রিল সরকার পার্টির তৎকালীন জেনারেল সেক্রেটারি পি সি যোশীর উপর থেকে ওয়ারেন্ট প্রত্যাহার করে নিল যাতে তিনি বিনা বাধায় সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে পারেন।

১২ই মে, ১৯৪২, যোশী গোয়েন্দা দপ্তরের জি আহ্‌মেদ-এর সঙ্গে দেখা করলেন

কিভাবে কম্যুনিষ্ট পার্টি আরো ব্যাপক ও সক্রিয়ভাবে সরকারকে সাহায্য করতে পারে এই ছিল তাঁদের আলোচ্য বিষয়। এই বৈঠকে জি আহমেদ, যোশীকে কম্যুনিষ্ট পার্টির তরফ থেকে প্রকাশিত 'Forward to Freedom (1941, Dec)' ইস্তাহার প্রকাশ করার জন্য তীব্র সমালোচনা করেছিলেন এবং এর সঠিক ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন। উত্তরে যোশী যা বলেছিলেন তা শুধু বিস্ময়কর নয়, কম্যুনিষ্টদের আসল চরিত্রও তাঁর এই সত্য ভাষণে প্রতিফলিত হয়েছে। কথা নয়, শুধু কাজ দেখে কম্যুনিষ্টদের বিপ্লবী চরিত্র বিশ্লেষণ করার জন্য তিনি আহ্‌মেদকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন : 'সরকারের উচিত আমাদের (কম্যুনিষ্টদের) কাজ দেখে আমাদের বিচার করা, কথা শুনে নয়, এবং আমাদের কাজ সরকারের পক্ষেই যাবে।' 'You (the Govt) should judge us (communists) not by our words, but by our action, and our action will be before you.'[৩১]

এর ঠিক দু'দিন পর যোশী হোম মেম্বার ম্যাক্সওয়েলের সাথে দেখা করেছিলেন। আগের মতো এবারও পার্টির তরফ থেকে সরকারকে সবরকম সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এমন কি কম্যুনিষ্টরা কোন 'সরকার বিরোধী' মনোভাব পোষণ করেন, একথাও যোশী অস্বীকার করেছিলেন। যোশী তথা কম্যুনিষ্টদের এই দৃষ্টিভঙ্গীর বয়ান ম্যাক্সওয়েল এক গোপন চিঠিতে যেভাবে লিখেছিলেন তা এইরকম 'যাই হোক তিনি (পি সি যোশী) কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে কোন রকম বৃটিশ বিরোধী মনোভাবের কথা অস্বীকার করেন' [However he (P.C. Joshi) disclaimed any anti-British feeling on the part of the Communist Party.]

ইতিমধ্যে, ১৯৪২ সালের ২২শে মার্চ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স বৃটেনের যুদ্ধ মন্ত্রীসভার প্রস্তাব নিয়ে নয়াদিল্লীতে আসেন। কংগ্রেস সহ সমস্ত রাজনৈতিক দল, এমন কি মুসলিম লীগ পর্যন্ত এই ক্রীপ্‌স মিশন প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু কম্যুনিষ্টরা বার বার ক্রীপ্‌স মিশন গ্রহণ করার জন্য কংগ্রেসের উপর চাপ সৃষ্টি করছিলেন। কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রধান পি সি যোশী নিজে মিঃ ক্রীপ্‌সের সাথে দেখা করেন এবং কম্যুনিষ্টদের অধীনে 'B Category' নামে সৈন্যদল গঠন করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। পি সুন্দরায়ার নেতৃত্বে এই 'B Category' সৈন্যদলের দায়িত্ব হবে ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামে নিয়োজিত আজাদ-হিন্দ বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ পরিচালনা করা।[৩২] ডঃ এ কে মজুমদারের লেখা থেকে জানা যায়, ইংরাজ সরকার যুদ্ধ প্রচেষ্টার সমর্থনে কম্যুনিষ্টদের অস্ত্রশস্ত্র বহন করার এবং কম্যুনিষ্ট স্বেচ্ছাসেবকদেরকে গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য একটা স্কীম চালু করল।[৩৩]

সুতরাং, স্বাভাবিকভাবেই ১৯৪২ সালের ২২শে জুলাই কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং তাদের শাখা সংগঠনগুলোর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হল।[৩৪] ইতিহাসের অদ্ভুত পরিহাস, সরকার যখন কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে

নিচ্ছিল, ঠিক তখনই কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লক, এবং সোসালিষ্ট পার্টিকে সরকার বেআইনী ঘোষণা করল। ৯ই আগষ্ট ভোরবেলা সরকার সমস্ত প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতাকে (অবশ্যই কম্যুনিষ্টরা বাদে) গ্রেপ্তার করে। তাঁদের গ্রেপ্তারের সাথে সাথেই জনসাধারণের দীর্ঘদিনের অসন্তোষ স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহের রূপ নেয় যা 'আগষ্ট বিপ্লব' বা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন নামে খ্যাত।

কম্যুনিষ্টরা তীব্রভাবে এই আগষ্ট আন্দোলনের বিরোধিতা করতে থাকলেন। কম্যুনিষ্ট পত্র-পত্রিকাগুলোতে ব্যাপকভাবে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচার করা হতে লাগল। দেশের যুব সম্প্রদায়কে এই আন্দোলনের বিরোধিতা করতে বলা হল এবং শ্রমিক ও কৃষকদের উৎপাদন বাড়িয়ে বৃটিশ সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সাহায্য করতে আবেদন জানানো হল। কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপাত্র 'পিপলস্ ওয়ার'- (People's War)২৭ সেপ্টেম্বর (১৯৪২) সংখ্যায় বলা হয়েছিল, 'এই 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন নৈতিক ও বাস্তবিক ভাবে দেশকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ও পঙ্গু করে দিচ্ছে যার ফলে জনসাধারণ স্বাধীনতা তো পাবেই না, বরং আক্রমণকারীর (Invader)পথই প্রশস্ত হবে।'

এই 'Invader' বা আক্রমণকারী হিসাবে সুভাষ বোসকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কেননা তিনি রাশিয়ার বর্তমান শত্রু (যদিও মাত্র কিছুদিন আগে মিত্র) জার্মানী ও জাপান থেকে সাহায্য নিয়ে ইংরেজদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করতে চাইছিলেন। বার্মার পতিতালয়গুলোতে সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছেন বলে সুভাষ বোসের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হয়েছিল। সুভাষের বিরুদ্ধে বন্দুক ধরার আবেদন জানানো হয়েছিল দেশবাসীর কাছে। 'পিপলস্ ওয়ার' পত্রিকায় বি টি রণদিভে লিখেছিলেন 'সুভাষ বোসের আহ্বান নিশ্চিত রূপেই প্রত্যেকটি সচেতন ভারতবাসীর কাছে পৌঁছবে এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে জনসাধারণ তাঁকে সেই উত্তরই দেবে যা একজন বিশ্বাসঘাতকের প্রাপ্য, সৎ ও দেশপ্রেমিক নাগরিকদের কাছ থেকে। তাই, যদি বোসের 'মুক্তি ফৌজ' নামধারী তস্কর বাহিনী দস্যুবৃত্তি ও লুণ্ঠনের অভিপ্রায়ে ভারতের মাটিতে পা রাখবার দুঃসাহস দেখায়, তবে সেই ঘৃণ্য কাজের যোগ্য জবাব তারা আমাদের কাছ থেকে পাবে।'[৫৫] ১৯৪৩-এর ১৮ই জুলাই 'পিপলস্ ওয়ার'-এ যুদ্ধ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে পার্টির উচ্চস্তরীয় নেতা গঙ্গাধর অধিকারী লেখেন হিটলার সুভাষ বোসকে তোজোর কাছে পাঠিয়েছেন। তোজো এই তথাকথিত দেশগৌরবকে ভারতীয় সেনাদলের পঞ্চম বাহিনীর সেনাপতি পদ প্রদান করেছেন। আকাশ থেকে পড়া এই বিশ্বাসঘাতকের দল (আজাদ হিন্দ ফৌজ) ভারতীয় সমারিক পোষাক পরলেও এরা স্বাধীনতার অগ্রদূত নয়, বরং ক্রীতদাসত্বের পত্তনীদার মাত্র।

অবশ্য ১৯৪১ সালের শেষভাগ থেকেই জাতীয় আন্দোলন ও জাতীয় নেতৃবৃন্দ সম্বন্ধে বিভিন্ন কুরুচিপূর্ণ খবর ও ব্যঙ্গচিত্র কম্যুনিষ্ট পত্রপত্রিকাগুলোতে ছাপা হচ্ছিল। জায়গায়

জায়গায় পার্টি কমরেডদের দিয়ে 'Mock Parliament' আয়োজন করা হচ্ছিল এবং জাতীয় নেতৃবৃন্দকে সেখানে কদর্যভাবে উপস্থাপিত করা হত। এই সমস্ত কুরুচিপূর্ণ অনুষ্ঠানগুলোর খবর ফলাও করে পার্টির মুখপত্রে পরিবেশিত হত। এমনই একটি সংবাদের কিছু অংশ এরকম- 'হঠাৎ জনতা দেখল, গান্ধীজী, নেহরু, আজাদ, রাজাজী, জিন্না, রায়, ও সাভারকর সুসজ্জিত মঞ্চে উঠে আসছেন, উত্তেজনা চরমে পৌঁছল। না! অবশ্যই এঁরা কেউ আসল ব্যক্তি নন। এসব চরিত্রের অভিনেতা মাত্র। কিন্তু তাদের চলা-বলা-ভাব-ভঙ্গী কি নিখুঁত অথচ ব্যঙ্গাত্মকভাবে প্রকাশিত (depicted absolutely in the raw)। প্রচুর মজা ও হাসি-তামাসার মধ্য দিয়ে বাস্তবিকই সঠিক রাজনৈতিক

ব্যঙ্গচিত্রে সুভাষ বোসকে দেখানো হচ্ছে একজন জাপানী সৈনিকের হাতধরা বামন, যে জাপানীদের ভারতের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে। [People's War, 1943]

সমালোচনা ও জনশিক্ষার আয়োজন.....গান্ধীজী সারাক্ষণ মঞ্চে বসেছিলেন, কিন্তু একটাও কথা বলেন নি। তবু তাঁর চাহনির মধ্য দিয়ে যেন তাঁর মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। হঠাৎ একজন বলে উঠল, 'গান্ধীজী কিছু বলছেন না কেন?' আজাদের কাছ থেকে গুরুগম্ভীর উত্তর এল, 'আজ ওঁর মৌনদিবস।' আবার একবার দর্শকরা হাসিতে ফেটে পড়ল।.....এই মকল পার্লামেন্টের পরিকল্পনা আমাদের কালিকটের কমরেডদের এক অভিনব প্রয়াস।"[৩৬]

যেহেতু গান্ধীজী ছিলেন জাতীয় আন্দোলনের প্রধান স্তম্ভ, তাই কম্যুনিষ্টদের অধিকাংশ গালাগালিই তাঁর প্রতি বর্ষিত হয়েছিল। কম্যুনিষ্ট পত্র-পত্রিকাগুলোতে তাঁকে ভণ্ড,

কম্যুনিস্টদের চোখে সুভাষ

পিছনে জাপানীরা আছে—সুভাষ বোসের ভারতে আগমনের এটাই হচ্ছে [illegible] বাস্তবতা। [People's War, 8 August, 1943]
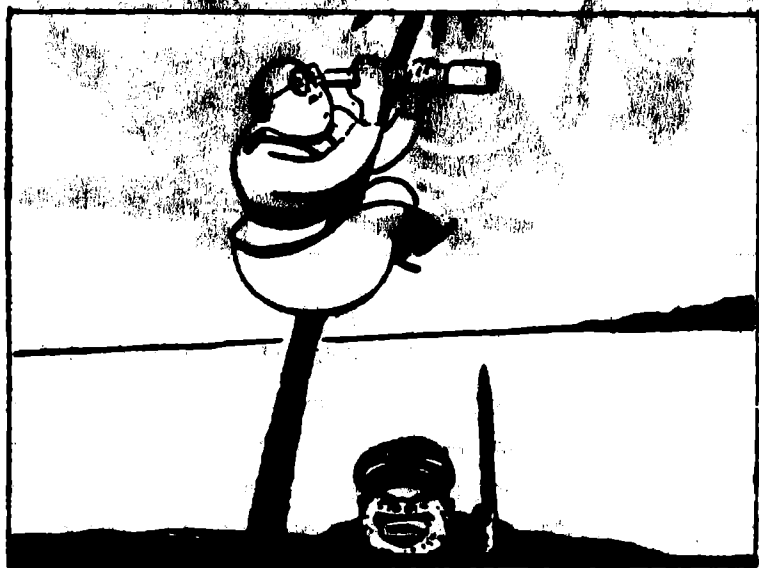
একজন জাপানী সৈনিকের পাহারায় তালগাছের উপর থেকে দূরদিগন্ত পর্যবেক্ষণরত সুভাষ বোস। [People's War, 1943]

ফ্যাসিস্টদের দালাল, সুযোগ সন্ধানী, প্রভৃতি নানা বিশেষণ দিয়ে আক্রমণ করা হয়েছিল। বিভিন্ন অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ ব্যঙ্গচিত্র আঁকা হয়েছিল গান্ধীজীকে নিয়ে। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের মাত্র এক সপ্তাহ আগে ১৯৪২ সালের ২রা আগষ্ট 'গান্ধীর দুর্গে কম্যুনিষ্ট ঝড়' শিরোনামে 'পিপলস্ ওয়ার' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, 'গান্ধীর পথ দেশকে পরাধীনতার গ্লানিতে নিমজ্জিত করবে এবং দেশকে ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনের কাছে উন্মুক্ত করবে। রাশিয়া ও চীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পথই হল দেশকে রক্ষা করার সঠিক পথ'।

কম্যুনিষ্টদের এই আক্রমণ থেকে সুভাষ বোস, জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ কোন জাতীয় নেতাই পার পেলেন না। 'পিপলস্ ওয়ারে'র বিভিন্ন সংখ্যায় বিকৃতভাবে নেতাজীকে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। একটা সংখ্যায় তাঁকে বামন হিসাবে দেখানো হল যেন তিনি জাপানী সৈনিকদেরকে পথ দেখিয়ে ভারতে নিয়ে আসছেন (চিত্র দ্রষ্টব্য)। একটা সংখ্যায় (People's War, 21 Nov. 1943) ব্যঙ্গচিত্রে দেখানো হল যে সুভাষ বোস ভারতের নিরন্ন দরিদ্র মানুষের উপর জাপানী বোমার সঙ্গে নেমে আসছেন। অপর এক সংখ্যায় দেখানো হল, ধ্বংসের প্রতিভূ জাপানীরা তাঁকে মুখোস হিসাবে ব্যবহার করছে (চিত্র)। আর একটা সংখ্যায় সুভাষকে দেখানো হল বিড়াল হিসাবে রিবেনট্রপের (হিটলারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী) কোটের মধ্যে অছেন। পার্টির অপর এক পত্রিকা Unmasked parties and Politics-এ ১৯৪০ সালে একটি ব্যঙ্গচিত্র দেখানো হয়েছিল জয়প্রকাশ নারায়ণ লাফিয়ে ক্যাঙ্গারুর থলের মধ্যে প্রবেশ করছেন এবং ক্যাঙ্গারুটি স্বয়ং গান্ধীজী।[৭] জয়প্রকাশ নারায়ণ ও তাঁর কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির কর্মীদের ক্ষুধার্ত শকুনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল ১৯৪৩ সালের ২১শে মার্চের People's War-এ। লেখা হয়েছিল, 'এইসব শকুনের দল (vultures) কংগ্রেসের খেয়ে কংগ্রেসেরই নামে সমস্ত অকংগ্রেসী সুলভ নোংরা কাজ করছে। এইসব নোংরা পিশাচগুলোকে (dirty vampires) রাজনীতির মঞ্চ থেকে দূর করে দিতে হবে।'

এখানে উল্লেখ্য যে, জহরলাল নেহরু প্রমুখ কিছু কংগ্রেস নেতা কম্যুনিষ্টদের এই চরিত্র হনন থেকে অনেকাংশে মুক্ত ছিলেন। কম্যুনিষ্টরা নেহরুকে নিজেদের সমমতাবলম্বী বলে মনে করতেন। কেননা আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বাধীনতা যুদ্ধকে নেহরুও জাপানীদের ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনের অঙ্গ বলে মনে করতেন। কম্যুনিষ্টদের মত তিনিও বলেছিলেন সুভাষ ভারতে ঢুকলে তিনি খোলা তরোয়াল হাতে সুভাষকে অভ্যর্থনা জানাবেন। তাই প্রয়োজনে নেহরু কম্যুনিষ্টদের সাথে হাত মিলিয়ে গান্ধী-সুভাষ-জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখের বিরোধিতা করবেন, এরকম একটা ধারণা যে কোন কারণেই হোক কম্যুনিষ্টদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। বৃটিশ গোয়েন্দাদের সঙ্গে আলোচনাকালে কম্যুনিষ্ট নেতা পি সি যোশী নেহরুর প্রতি কম্যুনিষ্টদের এই দৃষ্টিভঙ্গীর কথা খোলাখুলি জানিয়েছিলেন।

১৯৪২ সালের ২রা ডিসেম্বর ইংরেজ সরকারের Home Member স্যার রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে পি সি যোশীর যে গোপন বৈঠক হয়, তার রিপোর্ট ম্যাক্সওয়েল

পাঠান স্যার রিচার্ড টোটেনহামকে (Additional Secretary, Home)। তাতে তিনি লেখেন, 'মিষ্টার যোশী এ ব্যাপারে বেশ আত্মবিশ্বাসী যে, যদি জাতীয় সরকার গঠিত হয়, তাহলে নেহরু সহ অন্যান্য Non Gandhian-দের সাহায্য নিয়ে কম্যুনিষ্টরা সেই সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে ; এবং প্রকৃতপক্ষে সেখানে গান্ধীর ভূমিকা হবে নগণ্য।'

টোটেনহামকে পাঠানো এই নোট-এ ম্যাক্সওয়েল আরও লেখেন, '(সরকারকে সাহায্য করায়) কমুনিষ্ট পার্টির কৃতিত্বের ব্যাপারে যোশীর অনেক কিছু বলার ছিল। যেমন, কানপুরের একটি ঘটনা উল্লেখ করে তিনি বললেন যে, ছাত্রদের উত্তেজনার সময় কৌশলে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে কিভাবে তাঁরা (কম্যুনিষ্টরা) তাদের উত্তেজনাকে প্রশমিত করেছেন। কানপুরে একবার ছাত্রদের উপর পুলিশ লাঠিচালনা করলে ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে থানা পোড়াতে যাচ্ছিল। সেই অবস্থায় তাদের সরাসরি নিবৃত্ত করার চেষ্টা করা হত বোকামি। তাই, তখন যোশীর দলের কমরেডরা সেই উত্তেজিত ছাত্রদেরকে বোঝাল, 'থানা পুড়িয়ে কি হবে ? তার চেয়ে বরং এস, আমরা একটা ধিক্কার সভার আয়োজন করি।' এইভাবে সুযোগ পেলে ছাত্রদেরকে সংযত করতে তাঁর ক্ষমতা সম্বন্ধে যোশী নিজের উপর বেশ আস্থাশীল।'[৫৮]

২রা ডিসেম্বরের এই গোপন সাক্ষাৎকারেই যোশী কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র 'People's War'-এর কাগজের কোটা বাড়ানোর জন্য ম্যাক্সওয়েলকে অনুরোধ করেছিলেন। যুক্তি হিসাবে বলা হয়েছিল যে Fifth Column-এর (অর্থাৎ পঞ্চম বাহিনী বা বিশ্বাসঘাতক) বিরুদ্ধে আরো ব্যাপক জনমত গঠনের জন্য পত্রিকার সার্কুলেশন বাড়ানো প্রয়োজন।

এই Fifth Column হিসাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সমস্ত রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতাদের চিহ্নিত করা হয়েছিল। বোম্বেতে অনুষ্ঠিত কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্মেলনে ২৩শে মে-র এক প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, 'যে সমস্ত গোষ্ঠী এই Fifth Column-এর অন্তর্ভূক্ত তারা হল, বেইমান সুভাষ বোসের (traitor Bose) দল ফরোয়ার্ড ব্লক, যুদ্ধের শুরুতেই সমাজবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে যারা সেই কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টি এবং ফ্যাসিস্টদের বেতনভুক ট্রটস্কিপন্থীরা।'[৫৯]

১৯৪২ সালের ২রা ডিসেম্বরের ওই সাক্ষাৎকারেই পি সি যোশী ম্যাক্সওয়েলকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, অথবা বলা যায় উপযাচক হয়েই বলেছিলেন, দেশে ইংরাজ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা ক'রে এবং সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টার সমর্থনে তাঁদের পার্টি বিভিন্ন প্রদেশে যা যা করেছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ তিনি সরকারের কাছে পেশ করবেন। ম্যাক্সওয়েল তাঁর Note-এ লেখেন, He (Joshi) offered to provide concise and factual memoranda of the action taken in the various provinces.

যোশী কথা রেখেছিলেন। ১৯৪৩ সালের ১৫ই মার্চ কম্যুনিষ্ট পার্টির এই performance report তিনি বৃটিশ সরকারের কাছে পেশ করেছিলেন। ছোটখাট নয়

সে রিপোর্ট। ঘনভাবে সিঙ্গল স্পেসে টাইপ করা ১২০ পাতার সেই রিপোর্ট এবং তার সঙ্গে ম্যাক্সওয়েলকে লেখা যোশীর একটি Presonal চিঠি।[৬০] এই সমস্তই বর্তমানে জাতীয় মহাফেজখানা (National Archives) ঘেঁটে আবিষ্কার করেছেন ভারতবর্ষের সাংবাদিকতা জগতের অন্যতম পথিকৃৎ অরুণ শৌরী। Illustrated Weekly পত্রিকার ১৯৮৪ সালের মার্চ-এপ্রিলের চারটি সংখ্যায় সুদীর্ঘ সেই বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন অরুণ শৌরী। ম্যাক্সওয়েলকে লেখা যোশীর ১৪ই মার্চ তারিখের সেই চিঠিটি (ফোটোকপি দ্রষ্টব্য) উদ্ধৃত করা যাক।

CENTRAL HEADQUARTERS

Communist Party Of India

(Section of The Communist International)

Grams: PEOPLESWAR [illegible]
Phone: [illegible]

190 B, Khetwadi Main Road,
Bombay 4, March 15, 1943

Ref No.

Personal (1)

Dear Sir Reginald,

In another cover I am sending you a Memo on behalf of the Party Centre with enclosures, on the situation in the Provinces. I am afraid we are not yet quite used to writing documents for the Government but you will see that we talk straight and are frank.

If any of our statements are involved or need further clarification you have only to send me a note and I will try my best to make our attitude as clear as is humanly possible.

If you think any useful purpose will be served by my visiting you and explaining things, I will be quite willing to do so. I was told by Mr. Mackenzie that our attitude about the Congress arouses suspicion in our bonafides. If it is so I could explain it in a Memo.

The situation in the Provinces is deteriorating very fast. I hope you will be able to intervene successfully and help us to do our bit against the Fifth Column and in saving the country.

I am going to Malabar on the 16th, and will be back on the 29th. inst.

With good wishes,

Yours sincerely,
P. C. Joshi.

রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েলকে লেখা পি. সি. যোশীর চিঠির ফটোকপি

ব্যক্তিগত

বোম্বে-৪

প্রিয় স্যার রেজিনাল্ড, ১৫-মার্চ, ১৯৪৩

অপর একটি খামের মধ্যে আমাদের পার্টি সেন্টারের পক্ষ থেকে তোমাকে একটা স্মারকলিপি এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশের প্ররিস্থিতি সম্বন্ধে বিবরণ পাঠাচ্ছি। আমার আশঙ্কা, সরকারের জন্য নথিপত্র প্রস্তুত করতে হয়ত আমরা এখনও যথেষ্ট অভ্যস্ত হইনি। কিন্তু তুমি দেখতে পাবে যে আমরা খোলামেলা এবং সোজাসুজি কথা বলি।

যদি আমাদের কোন বিবৃতির আরও স্পষ্টীকরণ দরকার হয়, তাহলে তুমি শুধুমাত্র একটা ছোট চিরকুট আমাকে পাঠালেই আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী যথাসাধ্য পরিষ্কার করে বোঝাতে।

যদি তুমি মনে কর যে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করলে এবং বিষয়গুলো বুঝিয়ে বললে বিন্দুমাত্র লাভ হবে, তাহলে আমি তা করতে খুবই আগ্রহী। মিষ্টার ম্যাকেঞ্জি আমাকে বলেছিলেন যে কংগ্রেসের সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক করে। যদি একথা সত্য হয়, তাহলে আর একটা পত্রে আমি তা ব্যাখ্যা করতে পারি।

বিভিন্ন প্রদেশে পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি হচ্ছে। আমি আশা করি এ ব্যাপারে তুমি যথাযথ হস্তক্ষেপ করে পঞ্চম বাহিনীর বিরুদ্ধে ও দেশরক্ষায় আমাদের করণীয় কাজটুকু যাতে আমরা করতে পারি, তার জন্য আমাদের সাহায্য করবে।

আমি আগামী ১৬-তারিখে মালাবার যাচ্ছি এবং ২৯-তারিখেই ফিরে আসব।

শুভেচ্ছাসহ, তোমার বিশ্বস্ত,

পি. সি. যোশী—

এই চিঠিতে সাক্ষ্য বহন করছে সেই সময় কম্যুনিষ্টরা ইংরেজ সরকারের কতখানি বশংবদ ও তাঁবেদারে পরিণত হয়েছিলেন। এই চিঠির সঙ্গেই পাঠানো ১২০ পাতার রিপোর্টটিতে কোথায় কিভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের কতটুকু ক্ষতি করে যুদ্ধরত ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করেছে কম্যুনিষ্টরা—তারই খতিয়ান দেওয়া হয়েছে। পাঠকের সুবিধার জন্য রিপোর্টের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

- ৯ই আগষ্টের (১৯৪২) পর কংগ্রেসের সমস্ত নেতৃবৃন্দ জেলে যাবার পর আন্দোলনের রাশ কংগ্রেস সোসালিস্ট ও ফরোয়ার্ড ব্লকের হাতে চলে গিয়েছিল। কিন্তু আমরা সেই আন্দোলন বিনষ্ট করেছি।
- প্রত্যেক উপলব্ধ প্রচার মাধ্যমের সাহায্য নিয়ে আমরা দেশবাসীকে বুঝিয়েছি যে এখন

সরকার বিরোধী কার্যকলাপ শুধুমাত্র ফ্যাসিবাদের পথকেই উন্মুক্ত করবে এবং এইভাবে আমরা স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদেরকে জনতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। খুব কম ক্ষতি স্বীকার করেই এই কাজ আমরা করতে পেরেছি। এজন্য আমরা আমাদের কমরেডদের কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ, শুধু পুলিশের আশ্রয়ে থেকে এতবড় একটা কাজ আমরা করতে পারতাম না। আমাদের কমরেডদের তীক্ষ্ম দৃষ্টি ও নিপুণ সংগঠনের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে।

- এমনকি ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষক সংবাদপত্র Statesman এবং Times of India যা করতে পারেনি, আমরা তাই করেছি। ভারতীয় বুর্জোয়াদের বিজ্ঞাপন হারানোর ভয়ে এরা Fifth Column-এর বিরুদ্ধে একটানা প্রচার করতে পারে নি। কিন্তু আমরা পেরেছি। কারণ, আমাদের বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন নেই।
- কংগ্রেস ও সোসালিস্টরা দুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়ে গণ্ডগোল করতে পারত, এমনকি তারা স্বাধীনতা পর্য্যন্ত ঘোষণা করার পরিকল্পনা করেছিল। কি অসাধারণ তৎপরতায় আমরা তা বান্চাল করে দিয়েছি, বোম্বের পুলিশ কমিশনার তার সাক্ষী আছেন।
- আমাদের নীতি ও কর্মসূচী যে কতখানি কার্য্যকর হয়েছে তার প্রামাণ কংগ্রেস সোসালিষ্ট এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের গোপনে প্রচারিত বুলেটিনগুলি, যেখানে বলা হয়েছে, 'The struggle failed because of Communist treachery...'

এইবার কম্যুনিষ্টদের রাজ্যওয়ারী বিবরণের মধ্যে একটু দৃষ্টি দেওয়া যাক।

বোম্বে : আমাদের কমরেডদের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে শ্রমিকদের একটা বড় অংশকে আমরা আমাদের সঙ্গে রাখতে পেরেছি। ওরা Fifth column এর ডাকা ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেনি। সরকারকে স্বীকার করতেই হবে যে আমরা দেশকে একটা বড় বিপর্যয় থেকে বাঁচালাম, কিন্তু কিছু বেয়াড়া দেশীয় বুর্জোয়া মালিক Fifth column-এর সাথে স্বাধীনতার দাবীতে নিজেদের কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে। যাই হোক না কেন, ধর্মঘট রুখবার জন্য আমাদের কমরেডরা আপ্রাণ খাটছে। Our Comrades are continuously on their legs, explaining the position of the Red Flag and asking them (Workers) not to cease work.

কেরল : ১০ই আগষ্ট কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে আমরা একটা বিরাট মিটিং-এর আয়োজন করেছিলাম। জনসাধারণের সরকারবিরোধী ক্ষোভকে স্বাধীনতাওয়ালারা যাতে কাজে লাগতে না পারে, সেজন্যই এটা আমাদের করতে হয়েছিল (to prevent people from being used by the strugglewallas)।

পাঞ্জাব : প্রত্যেক জেলায় আমরা কৃষক সম্মেলন করছি জনসাধরণকে ফ্যাসিস্টপন্থীদের হাত থেকে টেনে আনার জন্য। যে সব সৈন্যরা ছুটিতে বাড়ীতে আসে তাদের মধ্যে একটানা প্রচার করে আমরা তাদের মনোবল বজায় রেখেছি। নাহলে অনেকেই এতদিনে সেনাবাহিনী ছেড়ে চলে যেত।

আসাম : স্ট্রাগলওয়ালাদের প্রচণ্ড আক্রমণ সত্ত্বেও আমাদের কমরেডরা সেখানে

বীরের মত কাজ করছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে পুলিশের কাছ থেকে আমরা কোন সহায়তা পাচ্ছি না। বরং পুলিশ আমাদের কমরেডদের হয়রানি করছে। মনে হয় পুলিশের মধ্যেই কিছু Fifth Column-এর এজেন্ট ঢুকে পড়েছে যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে। আমাদের কমরেড মিশ্র প্রধানমন্ত্রী (Premier)সাদুল্লাকে এই সন্দেহের কথা জানিয়েছেন। তিনিও আমাদের সাথে একমত হয়েছেন।

এইভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে পিছন থেকে ছুরি মারায় কম্যুনিষ্টদের পারদর্শিতা ও কৃতকার্যতার ১২০ পাতায় ঠাসা বিবরণ তাঁরা ইংরেজ সরকারের Home Member স্যার রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েলের কাছে পেশ করেছিলেন।

শুধু কেন্দ্রীয় স্তরেই নয়। সারা দেশে ইংরেজ সরকারের সাথে কম্যুনিষ্টদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের প্রমাণ পাওয়া যায় স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার রিচার্ড টোটেনহ্যম-এর একটি Note-এ। তিনি লিখছেন—

'এটা সত্যি উল্লেখ করার মত একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা, কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই Chief Secretary বা তাঁদের উপদেষ্টার সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করেছে।'[৬১]

১৯৪৩ সালে ২৩শে মে—১লা জুন বোম্বেতে কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বৈধকরণের পর এটাই ছিল কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রথম সম্মেলন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে এই সম্মেলনে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা থেকেও স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে কম্যুনিষ্টদের দৃষ্টিভঙ্গীর সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৩৪ সাল থেকে প্রচারিত তত্ত্ব 'The Draft Platform of Action' (এতে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে এদেশে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটানোর কথা বলা হয়েছিল) এই সম্মেলনে বিসর্জন দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগ কম্যুনিষ্ট পার্টির এই তাত্ত্বিক অবস্থান বদলানোকে 'The most remarkable feature of the 'preamble' to the New Constitution' বলে বর্ণনা করেছেন।[৬২]

এছাড়া, নিঃশর্তভাবে ইংরেজদের সহযোগিতা করার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে কম্যুনিষ্টদের 'বাম জাতীয়তার বিচ্যুতি' (Left nationalist deviation) বলে যে অভিযোগ করা হচ্ছিল, এই সম্মেলনে তা নস্যাৎ করে দেওয়া হয়। বরং ইংরেজদের আরও ব্যাপকভাবে সাহায্য না করতে পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছিল এবং উল্টে এই ব্যর্থতাকেই 'বাম জাতীয়তার বিচ্যুতি' বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। পার্টির তাত্ত্বিক নেতা শ্রী জি অধিকারীর ভাষায়—'বাম জাতীয়তার বিচ্যুতি প্রকৃতপক্ষে অন্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে; তা হচ্ছে জনগণকে দেশের প্রতিরক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে উৎসাহিত করাতে আমাদের ব্যর্থতা।....আমরা উৎপাদন অক্ষুণ্ণ রেখেছি এবং Fifth Column-দের অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মকে প্রতিরোধ করেছি। কিন্তু যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে এবং শ্রমিক ও কৃষকদেরকে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি।'[৬৩]

স্বভাবতই এই বাম-জাতীয়তার বিচ্যুতি জনিত ত্রুটি কাটিয়ে উঠবার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল আরো ব্যাপকভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করা। সম্মেলনে শ্রী পি সি যোশী দীর্ঘ ন'ঘণ্টার যে ম্যারাথন রাজনৈতিক দলিল পেশ করেছিলেন তাতে সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন দেশবাসীকে Fifth Column-এর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান জানানো হয়েছিল। এই Fifth Column-এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য তিনি সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগের কাছেও আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। কেননা, সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগ তখন কম্যুনিষ্টদের কাছে সুভাষ বোস ও জয়প্রকাশ নারায়ণকে রোখার জন্য বেশী প্রয়োজনীয় ছিল।

১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে কংগ্রেসের প্রায় সমস্ত প্রথম সারির নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সাথে সাথে সমগ্র ভারতবর্ষে যে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন শুরু হয়েছিল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অনুপস্থিতিতে সেই জাতীয় আন্দোলন পরিচালনায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সোসালিষ্ট পার্টির নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ।

অন্যদিকে, সীমান্তের ওপারে 'আজাদ-হিন্দ' বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস। নেতাজীর মুক্তি অভিযানে বৃটিশ সৈনিকদের মনোবল কিভাবে ভেঙ্গে পড়েছিল, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের স্বীকারোক্তিই তা প্রমাণ করে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও চার্চিল তাঁর লেখা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসের পঞ্চম খণ্ডে স্বীকার করেছেন যে, সেনাবাহিনীর অধিনায়কেরা জুন মাসে ইম্ফলের সঙ্কটজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে খুব উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। আরো রিজার্ভ সৈন্য, গোলাগুলি সরবরাহ ছাড়া অবস্থা যে সামলানো যাবে না, একথাও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বোচ্চ অধিনায়ক লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনের কাছে এক চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

সুতরাং, স্বাভাবিক কারণেই এবার কম্যুনিষ্টদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সুভাষ বোস এবং জয়প্রকাশ নারায়ণ। ভারতীয় সৈনিকদের মনোবল উদ্ধার করবার আশায় কম্যুনিষ্ট পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট 'ভারতীয় গণনাট্য সংস্থা' (IPTA) ব্যারাকে ব্যারাকে নাট্য গীতের আয়োজন করেছিলেন। কম্যুনিষ্ট পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির প্রাক্তন সদস্য এস এস বাটলিওয়ালা* বোম্বের একটি পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন—'আমাদের জেনারেল সেক্রেটারী প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে—আসাম এবং বার্মার যুদ্ধক্ষেত্রগুলিতে আমাদের IPTA সংস্থা নাচ, গান, আবৃত্তি এবং লোকসঙ্গীত ইত্যাদি অনুষ্ঠান করে সেখানে বৃটিশ সেনাবাহিনীর ভারতীয় সৈন্যদের মনোবল বজায় রাখতে, যাতে তারা মনে করে যে তারা দেশের জন্যই লড়ছে।'[৬৪]

---

* বাটলিওয়ালা ১৯৪৩ সালে কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। ২২-২-'৪৬ তারিখে বোম্বেতে এক প্রেস কনফারেন্স-এ জানিয়েছিলেন যে কম্যুনিষ্টরা বিশ্বাসঘাতক এবং তাই তাঁর পক্ষে পার্টির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের নিকৃষ্টতম শত্রু হিসাবেও কম্যুনিষ্টদের বর্ণনা করেছিলেন।

শুধু সৈন্যদের জন্যই নয়, ভারতের ছাত্র-যুবক-শ্রমিক-কৃষক সবার জন্যই 'ভারতীয় গণনাট্য সংস্থা' নাচ-গান-নাটক প্রভৃতির আয়োজন করেছিলেন। বৃটিশের ছত্রছায়ায় লাল পতাকা সম্বলিত কম্যুনিষ্ট পার্টির রকমারি সভায় যে সকল গান বা ছড়া গাওয়া হয়েছিল, তার কোন একটিও শুনলে আজকের কম্যুনিষ্টরা বোধহয় লজ্জা পাবেন। আজকের আমেরিকাকে দিনরাত্রি সাম্রাজ্যবাদী বলে গালাগালি দেওয়া কম্যুনিষ্টরা নিজেরাও বোধহয় এর পুনারাবৃত্তিতে সঙ্কোচ বোধ করবেন। এরকম একটি গান ছিল—

'কমরেড ধরো হাতিয়ার-ধরো হাতিয়ার
স্বাধীনতা সংগ্রামে নহি আজ এক্‌লা
বিপ্লবী সোভিয়েত, দুর্জয় মহাচীন
সাথে আছে ইংরেজ, নির্ভীক মার্কিন।'[৬৫]

এখানে মনে রাখা ভাল যে এই 'দুর্জয় মহাচীন' কিন্তু চিয়াং কাইশেক এর বুর্জোয়া চীন, তখনও মাও-সে-তুং-এর লাল চীন হয়নি।

এই প্রসঙ্গে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' উপন্যাসটির কথা হয়তো অনেকের মনে পড়বে। ছোট্ট একটি পরিবার, বাবা-মা ভারতছাড়ো আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে একই জেলের আলাদা দুই ওয়ার্ডে আবদ্ধ। আগষ্ট আন্দোলনের কোন হিংসাশ্রয়ী ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে ঐ জেলেই ঐ পরিবারের বড় ছেলেটির ফাঁসি হচ্ছে। কারণ তার কম্যুনিষ্ট ছোট ভাইটি জনযুদ্ধ সঞ্জাত এক মহান কর্তব্যবোধের প্রেরণায় তার দাদাকে ধরিয়ে দিয়েছিল। সে-ই তখন ঐ জেলগেটে অপেক্ষা করছে দাদার শবদেহ সংগ্রহ করার জন্য।

এইভাবে সরকারের সাথে সহযোগিতার ফলে স্বাধীনতা আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টির আখের গোছানো হচ্ছিল খুব ভালভাবেই। পার্টির অন্যতম নেতা গঙ্গাধর অধিকারীও স্বীকার করেছেন—'এটা একটা স্বীকৃত ঘটনা যে, ঐ সময় আমাদের পার্টি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সাংগঠনিক লাভ করেছে। আমরা আমাদের পার্টির সর্বভারতীয় মুখপত্র 'People's War' এবং অনেকগুলি প্রাদেশিক ভাষাতে আমাদের মুখপত্র প্রকাশ করতে পেরেছি। সেগুলির দ্বারা সারা ভারতে আমাদের পার্টির সংগঠনকে মজবুত করতে সক্ষম হয়েছি।'[৬৬]

১৯৪২ সালে যে পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৫০০০, মাত্র এক বছরের কম সময়ের মধ্যে ১৯৪৩ সালের মে মাসে তাদের সংখ্যা দাঁড়ালো ১৬,০০০ (ষোল হাজার)। ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলোতে ৩ লক্ষ, কিষাণ সভায় ৪১ হাজার ও ছাত্র সংগঠন এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে ২৫ হাজার নতুন সদস্য যোগ দিয়েছিলেন।[৬৭]

১৯৪৪ সালে কম্যুনিষ্ট পার্টির তরফ থেকে সারফ আমীর আলি (ইনি বোম্বের 'New Age' পত্রিকার দায়িত্বে ছিলেন) পার্টির পত্রিকাগুলোর অফিসে আরো বেশী সময়ের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সরকারের কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন। কিন্তু যার ভিত্তিতে তাঁর এই অনুরোধ, তা তাঁর নিজের ভাষাতেই উল্লেখ করা যাক, 'ভারতবর্ষের একমাত্র

দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি সরকারের সবচেয়ে সংকটের মুহূর্তে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সরকার যেন কখনও একথা ভুলে না যান। যুদ্ধের সময় এই কম্যুনিষ্ট পার্টিই কারখানার উৎপাদন অব্যাহত রেখেছে, কৃষকদের উৎসাহিত করেছে উৎপাদন বাড়াতে। এই সংকটের সুযোগ নিয়ে যে ভাবে Fifth Column সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করতে চেয়েছিল, একমাত্র কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রচেষ্টাতেই ওদের এই দুরভিসন্ধি বানচাল হয়ে গিয়েছে।'[৬৮]

People's War-এ দাবী করা হয়েছিল, 'আমাদের দীর্ঘদিনের নীতি ও শ্রমিকদের মধ্যে আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের জন্যই দেশের কলকারখানাকে আমরা Fifth Column-এর আঘাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছি।'[৬৯]

এই ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের অধীনে সেদিন দেশের শ্রমিকদের অবস্থার একটু খোঁজ নেওয়া যাক। যুদ্ধরত ইংরেজ সরকারের রসদ যোগাতে সাম্রাজ্যবাদী শোষণে দেশে একদিকে নেমে এসেছে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। অন্যদিকে যুদ্ধে সরবরাহ বজায় রাখার জন্য কলকারখানায় উৎপাদন বাড়াতে কম্যুনিষ্টরা শ্রমিকদেরকে ট্রেড ইউনিয়ন দ্বারা সংগঠিত করছিলেন। উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির ফলে দেশী ও বিদেশী মালিকদের মুনফা বাড়ছিল। সেই তুলনায় শ্রমিকদের মাইনেও বেড়েছিল কি? নীচের সারণী দুটি[৭০] কী বলে?

সারণী—১

সংগঠিত শিল্পে শ্রমিকের আয়ের হিসাব (টাকার অঙ্কে)

১৯৩৯-৪০	১৯৪০-৪১	১৯৪১-৪২	১৯৪২-৪৩	১৯৪৩-৪৪	১৯৪৪-৪৫	১৯৪৫-৪৬
২৮৭.৫০	২৯৩.০০	২৮২.২০	২৯১.০০	২১২.৬০	২৩৪.৬০	২৩৫.৫০

সারণী—২

সংগঠিত শিল্পে নীট লাভের হিসাব (লক্ষ টাকার অঙ্কে)

	১৯৩৯-৪০	১৯৪০-৪১	১৯৪১-৪২	১৯৪২-৪৩	১৯৪৩-৪৪	১৯৪৪-৪৫
বস্ত্র শিল্প	১৩৮	২৩১	৫৫৮	৯০০	১৩০২	১৪৬২
চিনি	২০৪	১৯০	২৬০	[illegible]	৩৬০	৩০৯

	১৯৩৯-৪০	১৯৪০-৪১	১৯৪১-৪২	১৯৪২-৪৩	১৯৪৩-৪৪	১৯৪৪-৪৫
লৌহ ও ইস্পাত	১৩৬.৪১	১৮৫.৪৩	২০০.০৮	২০৪.২৩	১৫১.২৮	১৫৯.৬৯
কাগজ শিল্প	৩০২	৫৩৭	৫৬৪	৬৮০	১০৪৬	৬৪৭
সিমেন্ট	১৭.৫৩	১৯.৮৩	২৫.০৭	৩৮.৭৭	২০.৪৫	৩০.৮৮
পাট	১৪৭	৫৪১	৪৯৪	৫১৮	৪২৫	৪৫০
কয়লা	১১১	৮৬	৯০	৮৪	৮১	১৭৭

অর্থাৎ, যুদ্ধের বছরগুলিতে যখন কলকারখানায় লাভের পরিমাণ বাড়ছিল, তখন শ্রমিকদের মজুরী কমে গিয়েছিল নিদারুণ দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও। কম্যুনিষ্টদের শ্রমিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের ফল হ'ল শ্রমিকের শোষণের মূল্যে মালিকের মুনাফাবৃদ্ধি।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই কম্যুনিষ্টরা তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির পটভূমিকায় নিজেদের অবস্থাটা বুঝতে পারলেন। সমস্ত ভারতবর্ষে তাঁদের বিরুদ্ধে ধিক্কারের বন্যা বইছে। দেশের আপামর মানুষের কাছে তাঁরা তখন বৃটিশ সরকারের His Master's Voice রূপে পরিচিত হয়েছেন। পার্টি-সহ সমস্ত গণ-সংগঠনগুলিতে তাঁদের সদস্যসংখ্যা ব্যাপকভাবে কমে যেতে লাগল।

ছাত্র-যুব সমাজের কাছেও কম্যুনিষ্টরা তখন কতখানি অপাংক্তেয় হয়ে গিয়েছিলেন, তা জানা যায় কম্যুনিষ্ট ঐতিহাসিক গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের বর্ণিত একটি ঘটনা থেকে। '২১শে নভেম্বর, ১৯৪৫, কম্যুনিষ্ট বিরোধী জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠনগুলি ডাক দিল ছাত্র ধর্মঘটের। হাজার হাজার ছাত্র বেরিয়ে এলো রাজপথে, দৃপ্ত-ধ্বনি তাদের মুখে : 'লাল কিল্লে তোড় দো, আজাদ্ হিন্দ ফৌজকো ছোড় দো' আর 'চলো দিল্লী'। ছাত্রসভায় অন্ধ কম্যুনিষ্ট বিদ্বেষ থেকে তারা বলতে দিল না ছাত্র ফেডারশনের কম্যুনিষ্ট নেতাদের।'[৭১]

কম্যুনিষ্টরা বুঝলেন দেশের মানুষ তাঁদের সঙ্গে নেই। যুদ্ধশেষে ইংরেজদের কাছেও তাঁদের আর তেমন প্রয়োজন ছিল না। তাই দেশের মানুষদের ঘৃণার তীব্র দহন থেকে রক্ষা করার বৃটিশ ছত্রছায়ার আড়ালও তখন নেই। রাশিয়ার নেতা স্ট্যালিন তখন আর মানুষের প্রেরণা নন। বরং চারিদিকে এক উন্মাদনার প্লাবন। সর্বত্র শুধু 'জয়হিন্দ' 'জয় নেতাজী' ধ্বনি।

ক্ষীয়মান এই জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় আবার তাঁরা ভোল পাল্টালেন। এবার

তাঁরা আই এন এ বন্দীদের মুক্তি দাবী করলেন, যে আই এন এ-কে মাত্র কিছুদিন আগেই তাঁরা 'তস্কর-বাহিনী', 'ক্রীতদাসত্বের পত্তনীদার' ইত্যাদি বলে গালাগালি দিয়েছিলেন। আই এন এ ডিফেন্স ফান্ডের জন্য কিছু চাঁদাও তুললেন।

কম্যুনিষ্ট পার্টির এই নূতন করে তাস্ সাজানোর প্রচেষ্টাকে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির প্রাক্তন সদস্য শ্রীঅরুণ বসু। তাঁর মতে—'পরাজিত আজাদ হিন্দ বাহিনী ও মৃত সুভাষ তখন ভারতীয় রাজনীতিতে এমন এক উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল, যার আঁচে সবাই উনুন ধরাতে চাইছিলেন। কম্যুনিষ্ট পার্টিও এই আঁচের তাপকেই লাগিয়েছিলেন তাঁদের উনুন ধরানোর কাজে, নতুবা তাঁদের পক্ষে অস্তিত্ব রক্ষা করাই সম্ভব ছিল না।'[৭২] অর্থাৎ কম্যুনিষ্টদের আর একটি মসৃণ ও নিপুণ ডিগ্‌বাজি। যদিও জনসাধারণের চোখে তা বড়ই প্রকট।

নির্দেশিকা

লেখকের নাম; গ্রন্থ-পত্রিকা বা নথির নাম, প্রকাশের তারিখ, পৃষ্ঠা সংখ্যা—এই পর্যায়ক্রমে উল্লেখিত হ'ল।

১। Arun Shourie: Illustrated Weekly, 18 March, 1984.

২। Jawaharlal Nehru: The Discovery of India, P. 235.

৩। ঐ; P. 238.

৪। Arun Shourie: Illustrated Weekly, 18 March, 1984.

৫। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়: দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৯।

৬। J Nehru: Discovery o India, P. 260.

৭। ঐ; P. 260.

৮। M R Masani: The Communist Party of India—A Short History, P. 63.

৯। S V Seshagiri Rao: End of a Scientific Utopia, P. 47.

১০। Stalin and German Communism (Harvard University press), P. 306.

১১। W L Shirer: The Rise and Fall of The Third Reich, P. 639, 640.

১২। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়: দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ ৬৯।

১৩। W L Shirer: Rise and Fall of Third Reich, P. 724.

১৪। ঐ; P. 835. ১৫। ঐ; P. 835-836.

১৬। S V Seshagiri Rao: End of a Scientific Utopia, P. 63-64.

১৭। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ ৭১৩।
১৮। S V Seshagiri Rao: End of a Scientific Utopia, P. 63.
১৯। Alexander Werth: Russia at War, P. 79-82.
২০। W L Shirer: The Rise and Fall of The Third Reich, P. 882-883.
২১। Arun Shourie: Illustrated Weekly, 18 March,1984.
২২। ঐ।
২৩। ঐ।
২৪। M R Masani: Com. Party of India, P. 21.
২৫। Arun Shourie: Illustrated Weekly, 8 April, 1984.
২৬। M R Masani: Com. Party of India, P. 28-29.
২৭। ঐ; P. 10 .
২৮। ঐ; P.19.
২৯। Madhu Limaye: Communist Party-Facts and fictions, P. 71.
৩০। A Secret Home Dept. document quoted in Masani, P. 25.
৩১। Pradip Bose: The Times of India, 21.10.'87.
৩২। Jay Prakash Narayan: Towards Struggle P. 179.
৩৩। M R Masani: Com. Party if India, P. 41.
৩৪। Marshall Windmiller & Overstreet: Communism in India, P. 155.
৩৫। Louis Fischer: The Great Challenge, P. 8.
৩৬। A. Shourie: I. Weekly, 18 March, 1984.
৩৭। ঐ।
৩৮। Madhu Limaye: Communist Party, P.41.
৩৯। A Shourie: I. Weekly, 18 March, 1984.
৪০। B T Ranadive: Communist, Feb,1949.
৪১। A Shourie: I. Weekly, 8 April, 1984.
৪২। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, ১-ম খণ্ড, পৃ ৩৩৩।
৪৩। M Limaye: Com. Party, P. 43.
৪৪। A Shourie: I. Weekly, 8 April, 1984.
৪৫। Arun Bose: The Statesman, Miscellany, 24.4.'88.
৪৬। Dr R C Majumder: History of Freedom Movement in India, Vol. 3, P.689.
৪৭। Marshall Windmiller & Overstreet: Communism in India, P. 207.

৪৮। দেশ : ১-লা চৈত্র, ১৩৮৬।
৪৯। A Shourie : I. Weekly, 8 March, 1984.
৫০। ঐ।
৫১। ঐ।
৫২। ঐ।
৫৩। Dr A K Majumder : Advent of Independence, P. 189.
৫৪। Dr. R C Majumder : History of Freedom Movement of India, vol—3, P. 689.
৫৫। B T Ranadive : People's War:10.1.'43.
৫৬। People's War: 26.7.'42.
৫৭। A Shourie : I. weekly, 1 April, 1984.
৫৮। ঐ; 18 March, 1984.
৫৯। M Limaye : Com. party, P.48-49.
৬০। A Shourie : I. weekly : 25 March, 1984.
৬১। ঐ।
৬২। ঐ।
৬৩। G Adhikari : People's War: 13.6.'43.
৬৪। S S Batliwala : Bombay chronicle: 17.3.'46.
৬৫। অমলেন্দু ঘোষ : ভারতে কম্যুনিজম, পৃ ১৫৬।
৬৬। Bhawani Sen—A Tribute, P. 31.
৬৭। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, ২-য় খণ্ড, পৃ ৭৮৯।
৬৮। A Shourie : I. weekly : 25 March, 1984.
৬৯। A Shourie : I. weekly : March, 1984.
৭০। M Limaye : Com. Party, P. 50-51.
৭১। গৌতম চট্টোপাধ্যায় : বাংলার ছাত্র সমাজ।
৭২। Arun Bose : The Statesman-Miscellany, 1.5.'88.

তৃতীয় অধ্যায়

পাকিস্তানের সমর্থনে

'The demand for Muslim self-determination for Pakistan is a just, progressive and national demand and is the positive expression of the very freedom and democracy.' অর্থাৎ 'মুসলিমদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী বা 'পাকিস্তান' এর দাবী একটি ন্যায্য, প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী দাবী এবং তা তাদের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ইতিবাচক প্রকাশ।'[১]

উপরোক্ত ইংরাজী উদ্ধৃতিটির এই অনুবাদ যদি সঠিক হয়, তাহলে ঠিক এটাই ছিল মুসলিম লীগের দেশভাগ ও পাকিস্তানের দাবী সম্বন্ধে কম্যুনিষ্টদের দলীয় বক্তব্য। এই বক্তব্যটি আমরা পেয়েছি কম্যুনিষ্ট পার্টি দ্বারা বোম্বের People's Publishing House (PPH) থেকে ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত "The Case for Congress League Unity' নামক পুস্তিকাটি থেকে। লেখক—সাজ্জাদ জহির, কম্যুনিষ্ট পার্টির একজন কেন্দ্রীয় নেতা ও তাত্ত্বিক প্রবক্তা।

এর পূর্বেই ১৯৪৩ সালের মে মাসে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত পার্টি কংগ্রেসে কম্যুনিষ্ট পার্টি ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান দাবীর সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। প্রস্তাবটির নাম ছিল, 'On Pakistan and National Unity.'[২]

কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র People's War-এ পার্টির আর একজন অন্যতম নেতা বি টি রণদিভে লিখলেন, 'ন্যায়সঙ্গতভাবে ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে বিচার করলে একথা মানতেই হবে যে, মুসলিমদের নিজস্ব জীবনভঙ্গিমা অনুসারে চলার জন্য, যখনই তারা চাইবে, একটা আলাদা রাজ্যগঠন করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের অবশ্যই আছে।' (In consonance with the demands of justice and fair-play, they must have the completest liberty to build their own life, liberty sanctioned by the right to form a seperate state if and when they choose.)[৩]

এইচ ভি শেষাদ্রি ১৯৮২ সালে প্রকাশিত তাঁর বহুল আলোচিত গ্রন্থ 'The Tragic Story of Partition'-এ এই মত প্রকাশ করেছেন যে, ভারত ভাগের এই দুঃখজনক ঘটনার জন্য দায়ী তিন খল নায়ক হল বৃটিশ সরকার, মুসলিম লীগ এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। কিন্তু আর একটি যে ক্রুর শক্তি সেদিন দেশভাগের সমর্থনে সোচ্চার হয়েছিল, তাদের ভূমিকাও কম ক্ষতিকারক ছিল না। কম্যুনিষ্টরা সেদিন দেশভাগ শুধু সমর্থন করেই ক্ষান্ত হন নি, দেশভাগের সপক্ষে জোরালো আন্দোলনও করেছিলেন।

ভারত বিভাগের ব্যাপারে কংগ্রেস আর কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে তফাৎ এই ছিল যে,

কম্যুনিষ্টরা স্বেচ্ছায়, সানন্দে, তত্ত্ব আর তথ্যের অবতারণা করে পাকিস্তান দাবীর যৌক্তিকতা মেনে নিয়েছিলেন এবং এর সপক্ষে প্রচার চালিয়েছিলেন। অন্যদিকে কংগ্রেস হয়েছিল নিজেদের কপট রাজনীতি এবং ২৭ বছরের মুসলিম তোষণ নীতির শিকার। মৌলানা আবুল কালাম আজাদও তাঁর 'India Wins Freedom' গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, মহাত্মা গান্ধী-ই আলি জিন্নাকে মুসলিম সমাজের অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেতে সাহায্য করেছিলেন।

'পাকিস্তান' সম্ভব কি না ? এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজীর দ্বিধাহীন ঘোষণা ছিল, 'একমাত্র আমার বুকের উপর দিয়েই দেশভাগ সম্ভব।'[৪] অর্থাৎ গান্ধীজী বেঁচে থাকতে তিনি কখনই দেশভাগকে মেনে নেবেন না।

কিন্তু ১৯৪৭-এর ৪ঠা জুন এক প্রার্থনা সভায় গান্ধীজী ঘোষণা করেন যে, যেহেতু মুসলমানরা হিন্দুদের সাথে একই দেশে থাকতে অনিচ্ছুক, তাই দেশ ভাগ মেনে নিতে হবে।[৫]

রাজাগোপালাচারী ও নেহরুর মতো নেতারা যাঁরা যে কোন মূল্যে তড়িঘড়ি ক্ষমতা চাইছিলেন, গান্ধীজীর দেশভাগের সম্মতি তাঁদের মধ্যে এক নতুন উৎসাহের সৃষ্টি করল। ১৪-১৫ জুন (১৯৪৭) এ আই সি সি মিটিং-এ 'জী-হুজুর' কংগ্রেস সদস্যরা দেশ ভাগের প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলেন। পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন এবং সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফুর খান ছিলেন এই দুই প্রতিবাদী সদস্য। কিন্তু গান্ধীজীর আশীর্বাদপুষ্ট নেহরু ও অন্যান্য তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে তাঁরা জয়ী হতে পারলেন না।

পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডনের বক্তব্য ছিল, প্রয়োজনে আমরা আরো দীর্ঘদিন বৃটিশদের অধীনে থাকব। কিন্তু স্বাধীনতার নামে আমাদের স্বপ্নের ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষকে আমরা খণ্ডিত হতে দিতে পারি না। খান আবদুল গফুর খানও বার বার কংগ্রেস নেতাদের কাছে দেশভাগের প্রস্তাবের বিরোধিতা করবার জন্য আবেদন জানালেন। কিন্তু তাঁদের সমস্ত প্রতিরোধই ব্যর্থ হয়ে গেল। কেননা নেহরুর মতে 'গান্ধীজী যখন দেশ ভাগের প্রস্তাবের পক্ষে সায় দিয়েছেন, তখন আমরা এর বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে পারি না'।[৬]

ব্যর্থ সীমান্ত গান্ধী চোখের জলে ভাসতে ভাসতে এ আই সি সি মিটিং থেকে বেরিয়ে আসলেন। 'গান্ধীজী আমাদের নেকড়ের মুখে ছুড়ে দিলেন,' গান্ধীজীর আশীর্বাদপুষ্ট দেশভাগের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এটাই ছিল তাঁর প্রতিক্রিয়া।

আসলে যে কোন মূল্যে কংগ্রেসীরা তখন ক্ষমতা চাইছিলেন। দিল্লীর মসনদ ছাড়া দেশ বা দেশের মানুষ তখন তাদের চিন্তায় ছিল না। ক্ষমতার লোভ কংগ্রেসীদের কতটা পাগল করে দিয়েছিল, নেহরুর একটি উক্তি থেকেই তা জানা যায়। 'দেশভাগ কি রোধ করা যেত না ? ঐতিহাসিক লিওনার্ড মোসলের এই প্রশ্নের যে উত্তর নেহরু দিয়েছিলেন তা হল এই যে, 'আমরা তখন ভীষণ শ্রান্ত। নতুন করে জেলে যাবার জন্য আমরা তখন আর মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম না।' কোটি কোটি মানুষকে উদ্বাস্তু জীবনের গ্লানি মাখিয়ে দেবার জন্য কি অদ্ভুত আত্মসমর্থন।

যাইহোক, মুসলিম লীগের ১৯৪০ সালে মার্চ মাসে লাহোরে গৃহীত পাকিস্তান প্রস্তাব সমর্থন করে কম্যুনিষ্টরা সেদিন দাবী করেছিলেন,Pakistan is a just demand for the Muslim homeland. কারণ, মুসলমান জাতি দীর্ঘদিন যে শুধু অত্যাচারিত হয়ে আছে (Oppressed Nationality) তাই নয়, ভবিষ্যতেও হিন্দু প্রাধান্যের জগদ্দল রথের চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা যাবার ভয় থেকে মুক্ত হবার একটাই মাত্র রাস্তা তাদের কাছে খোলা আছে এবং তা হল 'পাকিস্তান'।

গান্ধীজী ও কংগ্রেস লাহোর প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। বিরোধী ছিলেন সুভাষচন্দ্রও। কিন্তু কম্যুনিষ্টদের তরফ থেকে এই সমস্ত নেতৃবৃন্দের কঠোর সমালোচনা করা হল, পাকিস্তানের দাবী মেনে না নিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি নষ্ট করার জন্য। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্টরা এই অভিযোগ আনলেন যে—কংগ্রেস নিজে ইংরেজদের কাছ থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করছে অথচ সে অধিকার তাঁরা তাঁদের নিজ দেশবাসীদের একটি অংশকে দিতে রাজী হচ্ছেন না। সি পি আই-এর মতে এ নাকি 'Plain injustice'.[৭] অতএব এই Plain injustice-কে Justice-এ রূপান্তরিত করতে হলে মুসলমানদের ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা রাষ্ট্র গড়ার সুযোগ দিতে হবে (it must be given the right to secession)।

ইংল্যাণ্ডের চার্চিল মন্ত্রীসভা কর্তৃক প্রেরিত ক্রীপস্ মিশনও তাদের প্রস্তাবে 'right to Secession'-এর কথা উল্লেখ করল। যদিও এই প্রস্তাবে সরাসরি 'পাকিস্তান'-এর কথা বলা হয় নি, কিন্তু বাস্তবে it (Cripps Mission) conceded Pakistan in Principle.[৮] মুসলিম লীগ নেতা মহম্মদ আলি জিন্নাও স্বীকার করেছিলেন যে ক্রীপস্ মিশন ঘোষিত প্রস্তাবের ফলে 'Pakistan is recognised by implication.'[৯] এই প্রস্তাবে রাজ্যগুলিকে শুধুমাত্র ভারত ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাবার অধিকারই দেওয়া হল না, রাজ্যগুলি দেশ হিসাবে ভারতবর্ষের মতই সম মর্যাদার অধিকারী হবে, একথাও বলা হল (The same full status as the Indian union.)[১০]

স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ক্রীপসের ভারত ভাগের এই দুষ্ট বুদ্ধিজাত প্রস্তাব বাতিল করে দিল, কারণ it envisages the virtual partition of the country.[১১]

কিন্তু দল হিসাবে কংগ্রেস ক্রীপস মিশন প্রত্যাখ্যান করলেও রাজাগোপালাচারী ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি কিছু নেতা ক্রীপস্ প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন। রাজাগোপালাচারীর মূল উদ্দেশ্য ছিল ক্রীপ্সের দেশভাগের প্রস্তাব মেনে নিয়ে বাংলাকে ভারতের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। মৌলানার উদ্দেশ্য ছিল দেশভাগ মেনে নিয়ে মুসলিম লীগকে তাদের প্রাপ্য পাকিস্তান দিয়ে দেওয়া। কিন্তু গান্ধী 'ক্রীপস মিশন' প্রত্যাখ্যান করলেন। ফলে তাঁদের সমস্ত রকম পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। শেষ পর্যন্ত মরিয়া আজাদ ক্রীপ্সের কাছে গোপনে দূত পাঠালেন। এবং অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, তিনি সমস্ত কম্যুনিষ্ট বন্দীকে জেল থেকে

ছেড়ে দেবার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। যুক্তি ছিল, এই সমস্ত মুক্তিপ্রাপ্ত কম্যুনিষ্টরা ক্রীপস্ প্রস্তাবের সপক্ষে সমস্ত দেশে, বিশেষত পূর্বাঞ্চলে, জনমত সংগঠিত করতে পারবেন।[১২]

মৌলানা আজাদ যে এখানে তাঁর রাজনীতির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় রাখতে পেরেছিলেন, পাকিস্তান দাবীর সপক্ষে কম্যুনিষ্টদের তাত্ত্বিক যুক্তির অবতারণা তা প্রমাণ করেছিল। কম্যুনিষ্টরা মুসলিম লীগের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকারকে (right to secession) শুধু সমর্থন করলেন তাই নয়, বরং দাবী করলেন, যারা এই অধিকারকে শুধু জিন্নার একটা খামখেয়াল (special fad of Jinnah) বা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে কিছু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ভারত-বিভাগের ষড়যন্ত্র বলে মনে করেন, তারা দেশের মুসলিম নব জাগরণকে অস্বীকার করেই তা করেন।[১৩]

অতএব মুসলিম নবজাগরণ হচ্ছে, এবং এই নবজাগরণের নেতৃত্ব দিচ্ছেন 'Secular, antireligious' মুসলিম লীগ। সি পি আই-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সাজ্জাদ জাহীর এই জাগরণকে স্বাগত জানিয়ে লেখেন, 'সামগ্রিকভাবে ভারতের পক্ষে এবং বিশেষ করে মুসলিমদের পক্ষে এটা একটা ভাল ঘটনা ও শুভ লক্ষণ যে মুসলিম লীগের প্রসারণ ঘটছে এবং এর চারপাশে আমাদের লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষেরা সমবেত হচ্ছে।'[১৪]

রাজনীতির পরিহাস, মাত্র দুবছর আগে এই কম্যুনিষ্টরাই মুসলিম লীগকে সাম্প্রদায়িক, বৃটিশদের দালাল, 'feudal reactionary' বলে ঘোষণা করেছিলেন। মাত্র দুবছরের মধ্যে কম্যুনিষ্টদের চিন্তার এই বিবর্তন! কম্যুনিষ্টদের কাছে হয়তো কিছুই অসম্ভব নয়।

কিন্তু ঐতিহাসিকদের মতে মুসলিম লীগকে প্রতিক্রিয়াশীল হিসাবে চিহ্নিতকরণ আদৌ এদেশের কম্যুনিষ্টদের মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে রুশ তাত্ত্বিক দিয়াকভ্ এবং বুসেভিচ্ এক প্রবন্ধে মুসলিম লীগকে 'Politically bankrupt and reactionary' অর্থাৎ, রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া প্রতিক্রিয়াশীল দল বলে বর্ণনা করেছিলেন। ওই প্রবন্ধেই তাঁরা মুসলিম লীগকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করার জন্য দোষারোপ করেছিলেন। রুশ প্রভুদের এই বিশ্লেষণ সি পি আই তাদের চিরাচরিত অভ্যাসমত মেনে নিয়েছিল।

১৯৪১ সালে ইংরেজ সরকারের সাথে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েই কম্যুনিষ্টরা বুঝতে পারেন যে ভারতে মানুষ ক্রমশ তাঁদের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন। বে-আইনী ঘোষণা করে সরকার কম্যুনিষ্টদের শহীদ হওয়ার যে সুযোগ দিয়েছিলেন, হিটলারের রাশিয়া আক্রমণ তা বরবাদ করে দিয়েছিল। সরকারের সঙ্গে পার্টির সহযোগিতা যতই বাড়ছিল, জনমানসে পার্টির ভাবমূর্তি ঠিক ততটাই খারাপ হচ্ছিল। পার্টিও এটা স্বীকার করেছে, 'এ বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহেরও অবকাশ নেই যে ভারতের দেশপ্রেমিক জনসাধারণের বেশীরভাগ অংশই (majority of Indian patriotic opinion) মনে করে যে সারা দেশ যখন স্বাধীনতার জন্য লড়ছে, তখন কম্যুনিষ্টরা ছিল ঠিক তার

উল্টোদিকে।'[১৫]

সুতরাং 'majority of Indian patriotic opinion' যখন কম্যুনিষ্টদের স্বরূপ বুঝে গেছে, তখন 'minority of Indian opinion' এর পক্ষে যাওয়াই ভাল। তাতে দেশ বাঁচুক আর না বাঁচুক, অন্তত তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষা হবে। তাই মুসলিম লীগ হয়ে গেল 'The secular and antireligious League'

ঐতিহাসিক উইন্ডমিলারের মতে—'ভারতের জাতীয় স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন কম্যুনিষ্টদের তখন মুসলিম লীগের সমর্থন খুব বেশী প্রয়োজন ছিল। অন্ততপক্ষে তাদের জনযুদ্ধের মহান কর্তব্যে মুসলিম জনসাধারণকে সামিল করা ছিল খুব জরুরী।'[১৬]

কম্যুনিষ্ট নেতৃত্বের আশা ছিল, মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীকে সমর্থন করলে তাঁরা হয়তো মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হবেন। কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির তৎকালীন সদস্য শ্রী সোলি বাটলিওয়ালাও পার্টির নেতৃত্বের এই মনোভাব প্রসঙ্গে জানিয়েছেন 'পার্টির আশা ছিল লীগকে সমর্থন করলে তাঁরা মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হবেন, ঠিক যে ভাবে তাঁরা ১৯৩৬ সাল থেকে কংগ্রেসকে সমর্থন করে জাতীয়তাবাদী জনগণের অন্তরে কিছু পরিমাণে হলেও প্রবেশ করতে পেরেছিলেন।'[১৭]

লীগকে reactionary বলে মন্তব্য করার জন্য পার্টি থেকে দুঃখ প্রকাশ করা হল। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করে বলা হল—মুসলিম লীগ আর সামন্ততান্ত্রিক, প্রতিক্রিয়াশীল দল নয় বা শুধু সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক মাত্র নয়।[১৮]

কিন্তু নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই যে কম্যুনিষ্টরা এই মুসলিম তোষণের রাস্তায় গিয়েছিলেন তা তাঁরা স্বীকার করেন না। বরং সেদিন পাকিস্তানের দাবী সমর্থন করার পেছনে তাঁরা যে তাত্ত্বিক যুক্তির অবতারণা করেছিলেন তার ভিত্তি ছিল স্ট্যালিনের 'জাতিসত্ত্বার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার' তত্ত্ব।

কিন্তু এখানে কম্যুনিষ্টরা যে খেলো যুক্তির মারপ্যাঁচে দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিলেন তা আমরা এখনই বুঝতে পারব।

স্ট্যালিন জাতিসত্ত্বার আত্মনিয়ন্ত্রণের (Self determination) যে তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন তার সময়কাল ছিল ১৯৩৬ সাল। কিন্তু কম্যুনিষ্টরা মুসলমানদের পাকিস্তান দাবী সমর্থন করলেন ১৯৪১ সাল থেকে। অর্থাৎ এই দীর্ঘ আট বছর মুসলিম লীগ কম্যুনিষ্টদের চোখে ছিল সাম্প্রদায়িক, সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের পুতুল, ঐক্যের শত্রু ইত্যাদি। অর্থাৎ স্ট্যালিনীয় তত্ত্বের জন্য কম্যুনিষ্টরা মুসলিম লীগকে সমর্থন করেননি। তা করলে সেই ১৯৩৬ সাল থেকেই তাঁরা লীগকে সমর্থন করতেন। তাঁরা তাঁদের পিতৃভূমি রাশিয়ার স্বার্থেই এতদিন মুসলিম লীগকে গালাগালি দিয়েছেন। কারণ, তখন রাশিয়ার শত্রু ইংরেজদেরকে এই মুসলিম লীগ পরোক্ষ সহায়তা করছিল দেশে ইংরেজবিরোধী জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করে। আর এখন হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করার ফলে ইংরেজ হয়ে গেল রাশিয়ার বন্ধু। সুতরাং ইংরেজের মিত্র মুসলিম লীগও হয়ে গেল এদেশে

কম্যুনিষ্টদের বন্ধু। তাই কম্যুনিষ্টরা লীগের পাকিস্তানের দাবীকে সমর্থন করলেন। তাঁদের চোখে মুসলিম লীগ হয়ে গেল 'প্রগতিশীল শক্তি' এবং পাকিস্তানের দাবী হয়ে গেল 'ন্যায়সঙ্গত, প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী' দাবী (just, progressive and national demand)।

আর, এই ন্যায্য দাবী না মানার জন্য কম্যুনিষ্টরা কংগ্রেস ও গান্ধীজীকে 'অন্ধ ক্ষমতাগর্বী' (chauvinist), ঐক্যের শত্রু, সাম্প্রদায়িক, ইত্যাদি বিশ্লেষণে বিভূষিত করলেন।[১৯]

কম্যুনিষ্টরা তাঁদের চিন্তাজগতে কতখানি দেউলিয়া, এদেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানে স্ট্যালিনীয় তত্ত্বের অবতারণা তা আবার দেখিয়ে দিল। মাথাব্যথা সারাতে মাথাকেই কেটে বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন তাঁরা। স্ট্যালিনের প্রেসক্রিপশন্ অনুসারে (যা আসলে রাশিয়ার স্বার্থ অনুসারে) সাম্প্রাদায়িক সমস্যা সমাধান করার জন্য কম্যুনিষ্টরা নিজ মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদের গৌরবজনক ভূমিকা পালন করলেন।

কিন্তু রাশিয়ার যে রাজনীতির প্রেক্ষাপটে স্টালিন এই self determination-এর কথা ঘোষণা ক'রে সোভিয়েত রিপাবলিকগুলিকে রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি আদৌ সেরকম ছিল না। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা স্টালিনের এই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারে' ধর্মের কোন ভূমিকাই ছিল না।

কিন্তু কম্যুনিষ্টরা মুসলিম লীগের ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের দাবী সমর্থন করলেন। পার্টির মুখপত্র People's War-এ দেশভাগের দাবী সমর্থন করে লেখা হল ; 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যারা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে অবিশ্বাস করে, তারা এইসব আশ্বাসে সন্তুষ্ট হতে পারে না। অবশ্যই এদের ভয়কে সম্পূর্ণভাবে দূর করতে হবে। এদের সমানাধিকারকে এমনভাবে নিশ্চিত করতে হবে যা সহজে বোঝা যায়। এদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকারকে স্বীকার করা উচিত এবং স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার অধিকারও দেওয়া উচিত। It must be given the right of Secession, the right to form an independent state.)'[২০]

সি পি আই-এর সাধারণ সম্পাদক পি সি যোশী পার্টির মুখপত্রে লিখলেন, 'স্বরাজ যেভাবে আমাদের জন্মগত অধিকার, পাকিস্তানও মুসলমানদের কাছে ঠিক একই অবিচ্ছেদ্য অধিকারের দাবী রাখে।'[২১] সুতরাং পাকিস্তান দিতে হবে, নতুবা এ 'আজাদ' ভারত 'greater and more glorious' হয়ে উঠতে পারবে না।

জিন্না ও তাঁর মুসলিম লীগকে 'secular' বলে দাবী করে কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে বলা হল যে পাকিস্তান কখনই সাম্প্রদায়িক আন্দোলন নয়। (Nothing to do with pan Islamism)[২২] এবং ভবিষ্যতে পাকিস্তান হবে 'a secular state'।

জিন্না ও তাঁর লীগকে সাধারণ মানুষ (হিন্দু ও শিখ) বিশ্বাস করছেন না বলে কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে গভীর দুঃখ প্রকাশ করা হল। পার্টি থেকে শিখদের পাকিস্তানে গিয়ে বসবাস করার জন্য যে সু-পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল শিখরা তা অস্বীকার করার জন্য কম্যুনিষ্টরা গভীরভাবে মর্মাহত হলেন। তাঁরা বললেন, 'পাকিস্তানে যাওয়াই হবে শিখদের সর্বোৎকৃষ্ট

পন্থা। সেখানে শিখদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কিন্তু এটা দুর্ভাগ্য যে শিখেরা এই চিন্তাধারাকে পছন্দ করেন নি।'[২৩]

এমনকি ভারতের কোন্ কোন্ অংশ নিয়ে পাকিস্তান হওয়া উচিত তাও কম্যুনিষ্টরা তাঁদের মুখপত্রে প্রকাশ করেছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তান (অধুনা-বাংলাদেশ) বর্তমানে যে অঞ্চল নিয়ে গঠিত, কম্যুনিষ্ট পার্টি-প্রকাশিত মানচিত্রে তার থেকেও বেশী অঞ্চল নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছিল। তাঁদের প্রস্তাবিত মানচিত্রে সমগ্র নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দিনাজপুর এবং ত্রিপুরা পূর্ব-পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির দাবী জানানো হয়েছিল।[২৪]

কম্যুনিষ্টদের মুখপত্রে প্রকাশিত তাঁদের প্রস্তাবিত পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্র [মোটা কাঁটা দাগে চিহ্নিত]

দেশ পত্রিকার সৌজন্যে
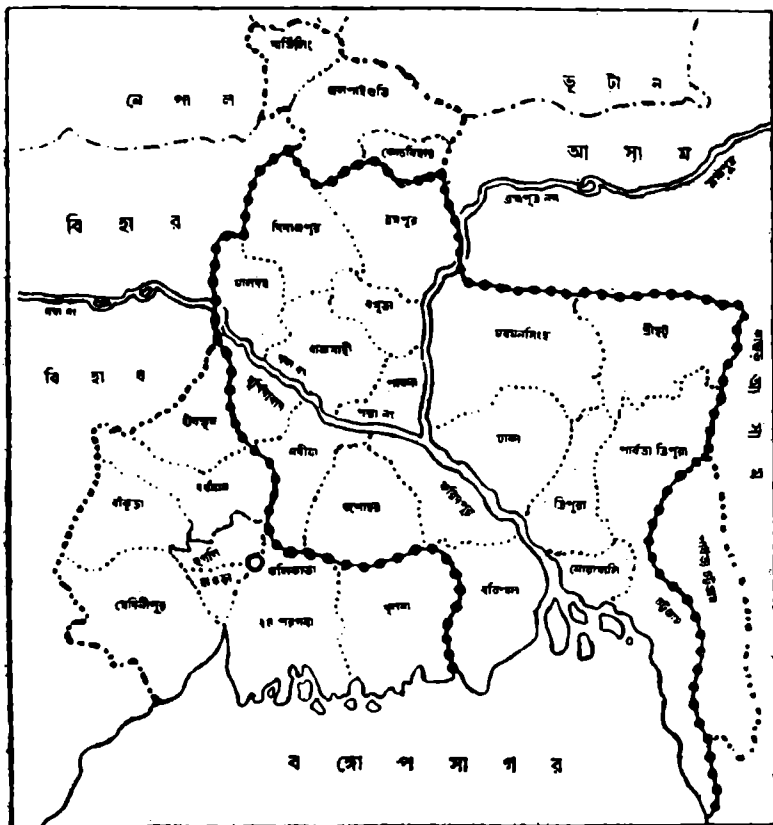
তবে বিস্ময়ের এখানেই শেষ নয়, সি পি আই ক্রমে আরো এগিয়ে দাবী করল যে ভারত কোনদিনই এক জাতি ছিল না, দ্বিজাতিও (হিন্দু ও মুসলমান) নয়। বরং ভারত হচ্ছে বিভিন্ন আলাদা আলাদা জাতিসত্তার এক সংমিশ্রণ মাত্র।

সুতরাং শুধু মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান দিলেই চলবে না। প্রত্যেক জাতির জন্যই আলাদা আলাদা রাষ্ট্র দিতে হবে। ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সি পি আই-এর প্রস্তাবে বলা হল—'ভারতীয় জনগণের মধ্যে যে যে গোষ্ঠীর নিজস্ব বাসস্থান হিসাবে একটা অঞ্চল আছে এবং একই ঐতিহাসিক পরম্পরা, এক ভাষা, সংস্কৃতি, মানসিকতা ও একই ধরনের আর্থিক গঠন আছে—সেই সকল প্রত্যেকটি গোষ্ঠীকে এক একটি পৃথক জাতি হিসাবে গণ্য করতে হবে (should be recognised as a distinct Nationality)। স্বাধীন ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে এইসব জাতিগুলির স্বায়ত্বশাসিত রাজ্য হিসাবে থাকার অধিকার থাকবে এবং যদি তারা চায় তাহলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকারও তাদের থাকবে। (right to exist as an autonomous state within the free Indian Union or Federation and will have the right to secede from it if it may so desire)।'[২৫]

ভারতের এই সম্ভাব্য 'distinct Nationality-গুলির পরিচয়ও এই প্রস্তাবে এইভাবে উল্লেখ করা হয়—'Such as the পাঠান, পশ্চিম পাঞ্জাবের অধিবাসীবৃন্দ, শিখ, হিন্দুস্তানী, রাজস্থানী, গুজরাটী, বাঙালী, অসমীয়া, বিহারী, উড়িয়া, তেলেগু, তামিল, কানাড়ী, মারাঠী, কেরালিয়ান এবং অন্যান্য।'[২৬]

ঐ প্রস্তাবেই শিখদের আলাদা হোমল্যান্ডের দাবী জানানো হল। এক অদ্ভুত তত্ত্বের অবতারণা করে কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে বলা হয়েছিল, শিখেরা হল, 'একটি কৃষক উপজাতি যারা তাদের ভাষাকে গঠন করে, উৎসাহ সৃষ্টিকারী লোকসাহিত্য তৈরী করে এবং নিজেদের জীবনভঙ্গিমাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য লড়াই করতে করতে নিজেদেরকে একটা জাতি হিসাবে ঐক্যবদ্ধ করেছে।'[২৭]

আশ্চর্য্যজনকভাবে পণ্ডিত নেহরুও কলকাতা কংগ্রেসে শিখদের জন্য আলাদা রাজ্য সৃষ্টির পক্ষে প্রস্তাব দিলেন। প্রস্তাবে বলা হল, 'পাঞ্জাবে শিখদের অধিকার সম্পর্কে আমাদের নিশ্চয়ই কিছু বিশেষ বিচার বিবেচনার প্রয়োজন আছে। উত্তরে শিখদের জন্য বিশেষ রাজ্যের ব্যবস্থা করা যেতেই পারে যেখানে তারা সত্যিই স্বাধীনতার স্বাদ (glow of freedom) পেতে পারবে, এবং আমি এই বিশেষ অধিকার দেওয়াকে অন্যায় বলে মনে করি না।'[২৮]

এমনকি গোর্খাদের জন্য আলাদা রাজ্যের দাবী জানিয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে ১৯৪৭ সালের ৬ই এপ্রিল Constituent Assembly-তে যে দাবী সনদ পেশ করা হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল, 'গোর্খাদের স্বার্থরক্ষার জন্য নেপাল, সিকিম ও দার্জিলিং জেলাকে নিয়ে একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্য গঠন করে দিতে হবে এবং এর নাম হবে 'গোর্খাস্থান'। ('Sovereign State' in the 'form of a single union out of

the feudal states of Nepal and Sikkim and the British administered district of Darjeeling.')[২৯]

কিন্তু গোর্খারা কখনও ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা রাষ্ট্র গঠন করার দাবী করেন নি। এমনকি ১৯৩৫ সালে সারা ভারত গোর্খা লিগ (AIGL)-এর তরফ থেকে সরকারের কাছে যে দাবী জানানো হয়েছিল সেখানেও তাঁরা ভারতবর্ষেই থাকার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন।[৩০]

কিন্তু কম্যুনিষ্টরা কেন ভারতকে এভাবে বিভক্ত করতে চেয়েছিলেন? ঐতিহাসিক ডঃ এ কে মজুমদারের মতে, কম্যুনিষ্টরা ভারতকে টুকরো টুকরো করার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তার মূল উদ্দেশ্য ছিল খণ্ড-বিখণ্ড জাতিগুলির ঝগড়ার সুযোগ নিয়ে কংগ্রেসকে পরাস্ত ক'রে ক্ষমতায় আসা এবং 'এইভাবে কম্যুনিষ্টরা একটা জাতীয়তাবিরোধী দল হিসাবেই তাদের ভূমিকা শুরু করল যে ভূমিকা তাদের এখনও বজায় আছে।'[৩১]

কম্যুনিষ্টরা ক্ষমতার জন্য দেশকে খণ্ড-বিখণ্ড করলেন বটে (খালিস্তান বা গোর্খাস্তানের সমর্থনে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তাঁরাই দিয়াছিলেন), কিন্তু তাঁরা তাঁদের আশানুরূপ ফল কোথাও পেলেন না। দার্জিলিং ছাড়া (আজ দার্জিলিংও তাঁদের হাতছাড়া) কোথাও এই বিচ্ছিন্নতাবাদকে মূলধন করে তাঁরা জনপ্রিয় হতে পারলেন না। এমনকি, যে পাকিস্তানের দাবী সমর্থন করতে তাঁরা পথে নেমেছিলেন সেখানেও তাঁরা প্রত্যাখ্যাত হলেন। জিন্না নিজে করাচী অধিবেশনে (ডিসেম্বর, ১৯৪৩) কম্যুনিষ্টদের বিশ্বাসঘাতক 'রাশিয়ার দালাল' বলে অভিহিত করলেন। পাকিস্তানের ব্যাপারে নাক না গলানোর (hands off) জন্যও তিনি কম্যুনিষ্টদের সাবধান করে দিয়েছিলেন। মীরজাফরদের হয়তো কেউই বিশ্বাস করে না।

বিচ্ছিন্নতাবাদকে মদত দিয়ে কম্যুনিষ্টরা আখেরে লাভ কিছু করলেন না ঠিকই, কিন্তু ভারতবর্ষের পক্ষে এর ফল হল মারাত্মক। বিখ্যাত সমাজতন্ত্রী নেতা রামমনোহর লোহিয়ার ভাষায়—'মনে হয় কম্যুনিষ্টরা এই আশা নিয়েই দেশভাগ করেছিল যে, দেশভাগ হলে তারা নবজাতক পাকিস্তান রাষ্ট্রের উপর ক্ষমতা বিস্তার করতে পারবে। ভারতীয় মুসলমানদের উপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পাবে, এবং নিরবয়ব অথবা জরাগ্রস্ত হিন্দুমনকে বিশ্লিষ্ট করার বড় রকমের ঝুঁকি তাদের গ্রহণ করতে হবে না। তাদের সমস্ত হিসাবেই ভুল হয়ে যায়। তাদের যেটুকু লাভ হয়, তা হল এই যে, তারা ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে নিজেদের প্রভাবিত কয়েকটি পকেট সৃষ্টি করতে পারে, এবং তা সত্ত্বেও তাদের সম্বন্ধে হিন্দুদের মধ্যে বড় রকমের কোন ঘৃণার ভাব জাগ্রত হয় না। তারা এইভাবে শুধু নিজেদের যে কিছুটা ক্ষতি করল তাই নয়, দেশের কল্যাণও তারা করতে পারল না।'[৩২]

এবার আবার কম্যুনিষ্টদের ভোল পাল্টানোর পালা। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়ে গেছে, কিন্তু যে ৯৫% মুসলমান পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন তাদের প্রায় ৫০%-ই খণ্ডিত ভারতে বসবাস করতে লাগলেন। পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য ডঃ জি অধিকারী এবার এক নূতন তত্ত্ব দাঁড় করালেন। পার্টির মুখপত্রে ছাপা হলো যে, 'এই মুহূর্তে ভারতে

মুসলমান সংখ্যালঘুদের সবচেয়ে বড় সমস্যা কীভাবে এদেশে তারা তাদের ধর্ম ও সম্পত্তি রক্ষা করে বেঁচে থাকবে? কী ভাবে তারা উর্দুভাষা এবং মুসলমান সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবে? মুসলমানদের তাই এখন উচিত, এমনকি মুসলিম লীডারদের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য যে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের যে পরিকাঠামো তৈরী হয়েছে তাতে নিজেদের ভূমিকা পালন করা।'[৩৩] কম্যুনিষ্টদের পক্ষে হয়তো সবই সম্ভব!

নির্দেশিকা

লেখকের নাম, গ্রন্থ-পত্রিকা বা নথির নাম, প্রকাশের তারিখ, পৃষ্ঠা সংখ্যা—এই পর্যায়ক্রমে উল্লেখিত হল।

১। Marshall Windmiller & Overstreet: Communism in India, P. 215.
২। Arun Shourie: Illustrated Weekly: 1 April, 1984.
৩। B T Ranadive: People's War: 9.8.'42.
৪। Indian Annual Register (1945): Vol-2, P. 119—120.
৫। Dr A K Majumdar: Advent of Independence, P. 172.
৬। Dr R C Majumdar: History of Freedom Movement in India, Vol—3, P. 625.
৭। ঐ; p. 623.
৮। Dr A K. Majumdar: Advent of Independence, P. 172-73.
৯। Dr R C Majumdar: History of Freedom Movement in India, Vol—3, P. 625.
১০। ঐ: পৃ ৬২৩।
১১। Dr A K Majumdar: Advent of Independence, P. 172-173.
১২। Transfer of Power, Vol—1, Document No—481.
১৩। People's War: 9.8.'42.
১৪। Windmiller & Overstreet: Communism in India, P. 214.
১৫। S G Sardesai: India and Russian Revolution, P. 99.
১৬। M Windmiller & Overstreet: Communism in India, P. 215.
১৭। S Batliwala: Facts vs. Forgery (1946), P. 19.
১৮। A Shourie: Illustrated Weekly: 1 April, 1984.
১৯। ঐ।
২০। People's War: 9.8.'42.
২১। P C Joshi: People's War: 20.8.'42.
২২। Pakistan and National Unity: Published by C P I in 1943.

২৩। People's War: 20.8.'42.

২৪। অতুল্য ঘোষ: দেশ: কংগ্রেস শতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৯৮৫।

২৫। M Windmiller & Overstreet: Communism in India, P. 493.

২৬। ঐ; P. 214.

২৭। ঐ; P. 214.

২৮। The Statesman: 7.1.'91.

২৯। M P Lama: The Statesman: 19.4.'88.

৩০। ঐ।

৩১। Dr A K Majumdar: Advent of Independence, P. 190.

৩২। Ram Manohar Lohia: Guilty Men of India's Partition Introduction, P. 9.

৩৩। People's Age : 23. 11. '47.

চতুর্থ অধ্যায়

ওরা শুধু ভুল করে যায়

কম্যুনিষ্টদের সম্পর্কে রাজনৈতিক মহলে একটি সুন্দর প্রবাদ আছে, 'কম্যুনিষ্টদের মহত্ত্ব এখানেই যে তাঁরা ভুল করেন এবং সেই ভুল স্বীকার করার সাহস রাখেন।' কিন্তু ভারতের কম্যুনিষ্টদের ক্ষেত্রে প্রবাদটি যে কারণে অসম্পূর্ণ, তা হল ওদের (ভারতের কম্যুনিষ্টদের) এই ভুলের দগ্‌দগে ঘা কোনদিন শুকোয় না এবং তাঁরা তা শুকানোর চেষ্টাও করেন না।

স্বাধীনতা আন্দোলনে কম্যুনিষ্ট পার্টির ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সি পি আই-এর জেনারেল সেক্রেটারি সি রাজেশ্বর রাও স্বীকার করেছেন, '....কোন কোন সন্ধিক্ষণে কম্যুনিষ্ট পার্টি খুব ভুল করেছিল। ...কোন কোন দেশপ্রেমিক নেতার বিরুদ্ধে সমালোচনা করাও ভুল হয়েছিল।'[১] কিন্তু দুঃখের বিষয় ভুল আর অন্যায়ের মধ্যে যে একটা মোটা দাগের পার্থক্য আছে কম্যুনিষ্টরা সেটা বুঝেও বোঝেন না। কোন মহৎ আদর্শ বা তাত্ত্বিক কারণে যে কম্যুনিষ্টরা সেদিন স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেন নি, তা পূর্বের অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা হয়েছে। বরং রাশিয়ার স্বার্থ-রক্ষার খাতিরেই তাঁরা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। তখন রাশিয়ার স্বার্থ তাঁরা রক্ষা করতে পারবেন কিনা, এটাই ছিল তাঁদের কাছে মুখ্য বিচার্য বিষয় ('anxiety to safeguard the interest of Russia')। বিখ্যাত কম্যুনিষ্ট তাত্ত্বিক নেতা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও নিজেদের ভূমিকার সাফাই গাইতে গিয়ে ভুলবশতঃ স্বীকার করে ফেলেছেন— 'সোভিয়েত ধ্বংসের যে মতলব তখন শুধু হিটলার নয়, বকলমে আরও অনেকে নানা ঢঙে ও ছদ্মবেশে করেছিল, তাতে সৃষ্টি হয়েছিল এক মারাত্মক পরিস্থিতি। ৪২-সালে আমাদের মনোভাব ও কর্মনীতি বুঝতে হলে এটা মনে রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। কোথাও আমাদের কথা ও কাজের ভুলচুক নিশ্চয়ই হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রকে ফ্যাসিজমের সহায়ক ভেবে আক্রমণ করা যে ভুল ছিল, তা পরে জেনে আমরা ভ্রান্তি স্বীকার করেছি। কিন্তু সেই সময় প্রকৃত ঘটনা জানবার উপায় ছিল না।'[২]

কিন্তু কোন্ প্রকৃত ঘটনা কম্যুনিষ্টরা সেদিন জানতেন না? —সুভাষচন্দ্র দেশের স্বাধীনতার জন্য বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন, সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য নয়, এই প্রকৃত ঘটনা কম্যুনিষ্টরা জানতেন না? এই প্রকৃত ঘটনাও কি তাঁরা জানতেন না আজাদ-হিন্দ বাহিনী কোন লম্পট-দস্যুদের লুটেরা দল নয়? এই প্রকৃত ঘটনাও

কি তাঁদের কাছে অজানা ছিল দেশের আপামর জনসাধারণ আগষ্ট আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করার জন্যে ? আসলে যে প্রকৃত ঘটনাটা কম্যুনিষ্টরা বুঝতে পারেন নি, আজও পারেন না বা চেষ্টাও করেন না তা হল আন্তর্জাতিক বা দেশীয় কোন বিষয়েই নিজস্ব স্বাধীন মূল্যায়ণের ক্ষমতা এদেশের কম্যুনিস্টদের নেই। আর এই সোজা কথাটা বোঝেন না বলেই সেদিন তাঁরা ঐ নতুন তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছিলেন Our National Enemy is our International Ally.'[৩]

কম্যুনিষ্ট-মহল থেকে এ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয়েছে যে, তাঁদের 'ভুল' দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে খুব একটা ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে নি, বরং আন্দোলনের শ্রেণী চরিত্রের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল আন্দোলনের ব্যর্থতা। কারণ হিসাবে তাঁরা দেখিয়েছেন জাতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাঁদের শক্তির অপ্রতুলতা। কিন্তু আমরা দেখেছি কিভাবে কম্যুনিষ্ট পার্টির তরফ থেকে সরকারকে বোঝানো হয়েছে তাঁদের ability এবং potentiality-র কথা! এবং এটাও যদি সত্যি হয় যে সরকারের আনুকূল্য পাওয়ার জন্য কম্যুনিষ্টরা সেদিন প্রকৃত সত্য গোপন করে তাঁদের শক্তি সম্পর্কে মিথ্যা আস্ফালন করেছিলেন, তবুও একথা মনে রাখতে হবে, মাত্র কয়েকজন মীরজাফরই সেদিন পলাশীর প্রান্তরে দেশের স্বাধীনতার সূর্য্য ডুবিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এবং কম্যুনিষ্টরাও তাই ছিলেন।

মুসলিম লীগের পাকিস্তান-এর দাবী যদি সেদিন কম্যুনিষ্টরা সমর্থন না করতেন, তবে হয়তো দেশ-বিভাগের অভিশপ্ত ঘটনা এড়ানো যেত। কিন্তু কম্যুনিষ্টরা সেদিন তা করেন নি। পার্টির স্বার্থে শুধুমাত্র পাকিস্তানের দাবীকে সমর্থন করেই তাঁরা ক্ষান্ত হননি, পশ্চিম বাংলার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু পর্যন্ত সেদিন মুসলিম লীগ নেতা, কুখ্যাত ১৯৪৬-এর 'Great Calcutta Killing' এর নায়ক সুরাবর্দীর সাথে একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের দাবী জানিয়েছিলেন। কম্যুনিষ্টদের এই ঘৃণ্য ভূমিকাকে সঠিকভাবেই ব্যক্ত করেছেন প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ডাঃ জে ডি শেঠি, 'কমিউনিষ্টদের সম্ভবতঃ সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্ত হল, পাকিস্তান সৃষ্টির পক্ষে তাদের তাত্ত্বিক যুক্তি খাড়া করা। দেশ বিভাগ রোধ করা এই কারণেই সেদিন অনেক বেশী কঠিন হয়ে পড়েছিল বলে সাধারণভাবে ঐতিহাসিকরা একমত। পাকিস্তানের দাবীদার মুসলিম লীগের কাছে সত্যিকারের বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী বলে কিছু ছিল না। জাতিসত্ত্বার স্তালিনীয় তত্ত্বের নামে কমিউনিষ্টরা সেদিন মুসলিম লীগের অন্যায় আবদারের প্রতি বৌদ্ধিক মদত জুগিয়েছিলেন দেশ ভাগের দাবীকে যুক্তিযুক্ত বলে জাহির করেছিলেন। অথচ, স্তালিন তাঁর নিজের দেশের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বকে আমল দেননি'।[৪]

কৌশলে ও নীতিতে কম্যুনিষ্টরা পরবর্তীকালেও যে ঐ একই পথেই হেঁটেছেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ কেরলে মুসলিম লীগের সঙ্গে আঁতাত করে সরকার গঠন। স্বাধীনোত্তর ভারতে কম্যুনিষ্টরাই প্রথম এমন একটি সাম্প্রদায়িক ও ভারতবিরোধী দলকে (এই মুসলিম

লীগ পাকিস্তান দাবীর সমর্থক ছিল) মন্ত্রীত্বের অংশীদার করেছিলেন। এবং এখানেই শেষ নয়। লীগের দাবীর কাছে মাথা নত করে মুখ্যমন্ত্রী ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ কেরালায় 'মাল্লাপুরম্' নামে একটা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা পর্যন্ত গঠন করে দিয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে এই কম্যুনিস্টরাই হঠাৎ মুসলিম লীগের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা আর বিচ্ছিন্নতাবাদের ভূত দেখতে পেলেন। লীগের সঙ্গে শুধু বন্ধুত্বের ছেদ নয়, '৮৭-র বিধানসভা নির্বাচনকালে নাম্বুদ্রিপাদ আবার বিবেকানন্দ ভজনাও শুরু করলেন। কিন্তু হঠাৎ লীগ সাম্প্রদায়িক হয়ে গেল কেন? কিংবা হিন্দুরা সেকুলার! আসলে এতকাল মুসলিম লীগের নেতৃত্বাধীন মুসলমান সমাজের block vote ছিল কম্যুনিষ্টদের ক্ষমতা অর্জন করার তুরূপের তাস। উল্টোদিকে দীর্ঘদিনের ছিন্নবিচ্ছিন্ন হিন্দু সমাজ কম্যুনিষ্টদের ভোটের দাবী মেটাতে পারছিল না। নাম্বুদ্রিপাদের নিজের কথায়, 'হিন্দুরা এখানে (কেরালায়) জাতপাতের শিকার হয়ে সামাজিকভাবে এমনভাবে বিভক্ত যে তাদের মধ্যে সত্যিকারের ঐক্য (Hindu Soildarity) নিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।'[৫]

কিন্তু যে মুহূর্তে হিন্দুরা কেরালায় সংগঠিত হতে শুরু করেছে, এবং তার পরিণতি স্বরূপ কেরালায় বিশাল আকারের ঐতিহাসিক হিন্দু সম্মেলনগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে, তৎক্ষণাৎ নাম্বুদ্রিপাদ ও তাঁর সংগঠন উল্টো সুর গাইতে সুরু করেছেন, হিন্দু ভোটের আশায়।

শুধু চল্লিশের দশক নয়, ভারতের কম্যুনিষ্টরা কোনদিন-ই প্রকৃত ঘটনা জানতে পারেন নি, জানবার চেষ্টাও করেন নি। চৈনিক আগ্রাসনের দু-দশক পরেও তাঁরা স্বীকার করেন না, চীন ভারত আক্রমণ করেছিল। বরং সেদিন ভারতকেই আক্রমণকারী সাজিয়ে চীনের সৈন্যদের 'মুক্তিবাহিনী' বলে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে প্রচার করা হয়েছিল, চীন ভারতকে মুক্ত করতে আসছে। নাট্যকার উৎপল দত্ত চীনকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রবন্ধও লিখেছিলেন। এমনকি ভারতের সবথেকে উপকারী ও বিশ্বস্ত বন্ধু রাশিয়াও নেহরু সরকারকে সাফ জানিয়ে দিয়েছিল 'চীন আমাদের ভাই, ভারত আমাদের বন্ধু।'[৬]

কম্যুনিষ্টরা অবশ্য বার বার প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন, তাঁরা রাশিয়া বা চীনের নির্দেশিত পথের পথিক নন, বরং জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁদের নির্দিষ্ট নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী আছে এবং এই দাবী প্রমাণ করবার জন্য তাঁরা হাস্যকরভাবে দাবী করেন—(১) রাশিয়ার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁরা এদেশে কংগ্রেস-বিরোধী আন্দোলন করছেন এবং (২) রাশিয়া ও চীনের তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের হাওয়া এসেছে তাঁরা প্রকাশ্যে তার বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন।

কম্যুনিষ্টদের কংগ্রেস বিরোধিতা কেমন? কুস্তির রিং-এ যখন কুস্তিগিররা লড়াই করেন, তখন দর্শকরা হাত-তালি দেন, ভাবেন কী লড়াইটাই না লড়ল। আসলে কিন্তু ওটা থাকে লোক দেখানো মারামারি। কম্যুনিষ্টদের কংগ্রেস বিরোধিতার রূপটাও কিন্তু অনেকটা সেরকম। এদেশের মানুষের স্মৃতিশক্তির উপর কম্যুনিষ্টদের বিশ্বাস এত কম যে তাঁরা

ভাবতেই পারেন না গত দিনগুলোর ইতিহাস মানুষের স্মৃতিপটে এখনও আঁকা আছে। যতবার কংগ্রেস বিপদে পড়েছে, ততবারই পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়ে এই কম্যুনিষ্টরাই আবির্ভূত হয়েছেন, মদত যুগিয়েছেন কংগ্রেস পার্টি ও সরকারকে। '৭৫ সালের জরুরী অবস্থার কালো দিনগুলোতে সি পি আই প্রকাশ্যে ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে মদত যুগিয়েছিল। সি পি আই পরোক্ষভাবে মদত যুগিয়েছিল নির্লিপ্ত ভূমিকা পালন করে।

ঐ সময় সারা ভারতে যখন লক্ষাধিক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, লোক সংঘর্ষ সমিতি, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ-এর কর্মী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, তখন কম্যুনিষ্টদের লালদুর্গ এই পশ্চিম বাংলায় অত্যাচারী সিদ্ধার্থ রায়ের রাজত্ব থাকা সত্ত্বেও একজন কম্যুনিষ্ট কর্মী বা নেতা জরুরী অবস্থার বলি হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হননি। জ্যোতি বসু, নাম্বুদ্রিপাদ, প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরকিষণ সিং সুরজিৎ, বিমান বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য কারও কেশাগ্রও ইন্দিরাগান্ধী স্পর্শ করেন নি। কেননা তাঁরা কেউই তখন সরকারের কাছে বিপজ্জনক বলে বিবেচিত হননি।* অবশ্য সে প্রশ্নও ছিল না। রাশিয়া তখন জরুরী অবস্থার সবচেয়ে বড় সমর্থক। এদেশে কম্যুনিষ্টদের রাশিয়ার স্রোতে গা না ভাসিয়ে ভেসে থাকা সম্ভব ছিল না।

কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর কোপ দৃষ্টির শিকার হয়েছিলেন তথাকথিত বুর্জুয়া শ্রেণীর প্রতিভূরা। পশ্চিম বাংলায় গৌরকিশোর ঘোষ, বরুণ সেনগুপ্ত, অমলকুমার বসু, ডাঃ সুজিত ধর, তপন ঘোষ, হরিপদ ভারতী, সুকুমার ব্যানার্জী, এমনকি প্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং সারা ভারতে এইরকম আরও এক লক্ষ কুড়ি হাজার মানুষ সরকারের কাছে বিপজ্জনক বলে সেদিন চিহ্নিত হয়েছিলেন এবং মিসায় (MISA) কারারুদ্ধ হয়েছিলেন।

কম্যুনিষ্টদের তরফ থেকে সেদিন জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করা হয় নি। বরং সেদিন তাঁদের বিপ্লবের বুলি আর গণ-আন্দোলনের লম্ফ ঝম্ফ রাশিয়ার স্বার্থের জারক রসে জারিত হয়ে 'Durate'-এ স্থান পেয়েছিল।

'Durate' হল যে কোন সঙ্কটের মুখে রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের মন্ত্রী কার্দিনাল গ্র্যানডেল-এর একটি বহু মূল্যবান উপদেশ। এই ল্যাটিন শব্দটির বাংলা তর্জমা হল, যে কোনও ভাবে বেঁচে থাকো। তাতেই সঙ্কট উত্তীর্ণ হবে। কম্যুনিষ্টরাও এই উপদেশ সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। জরুরী অবস্থার কালটা তাঁরা কোন প্রতিবাদ না করে একান্ত নিঃশব্দে অনেকটা গা বাঁচিয়ে পার করে দিয়েছিলেন।

অবশ্যই কম্যুনিষ্টরা দাবী করতে পারেন যে, ওই সময় তাঁদের কয়েক হাজার কর্মী ঘর ছাড়া ছিলেন। কিন্তু সেটা কি আদৌ রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিকভাবে জরুরী অবস্থার

---

* CPI (M)-এর একমাত্র নেতা জ্যোতির্ময় বসুকে তখন গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কিন্তু এর কারণ ছিল পার্টির নেওয়া 'লাইন' এর স্রোতে গা না ভাসিয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে জরুরী অবস্থার বিরোধিতা করেছিলেন।

বিরোধিতা করার জন্য? না। বরং ওটা ছিল সি পি এম, নকশাল ও কংগ্রেসের জায়গা দখলের লড়াই যার বলি হয়েছিলেন কিছু আদর্শবাদী যুবক এবং সেই নাটকও জরুরী অবস্থার আগেই মঞ্চস্থ হয়েছিল।

অবশ্য আগেও '৬৯ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যাপারে কংগ্রেস যখন দুভাগ হয়ে গেল তখন এই কম্যুনিষ্টরাই ইন্দিরা গান্ধীর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর মনোনীত রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী ভি ভি গিরিকে সমর্থন করেছিলেন। ১৯৭৭ সালে জনতা পার্টির উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেও তাঁরা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কেন্দ্রে কংগ্রেসের কোন বিকল্প তাঁরা চান না। এমনকি রাজীব গান্ধীর আপাতত কোন বিকল্প নেই বলে কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ জুলাই (১৯৮৭) মাসের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যে ভূমিকা নিয়েছিলেন তাও নিশ্চয় গৌরবজনক নয়। ঐ নির্বাচনে কংগ্রেসের ভোট যেন ভাগ না হয়, সেজন্য কম্যুনিষ্টরা নিজেদের প্রার্থী জাষ্টিস্ কৃষ্ণ আয়ারকে (যিনি আবার ছিলেন জরুরী অবস্থার বড় সমর্থক) দাঁড় করিয়েছিলেন বিরোধী ঐক্যের বিঘ্ন ঘটিয়ে। ফলে কংগ্রেস প্রার্থী আর ভেঙ্কটরমন-এর জেতার পথই প্রশস্ত হয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ঠিক পর পরই আবার কম্যুনিষ্টরা 'রাজীব হটাও' আন্দোলন শুরু করেছেন। আশ্চর্য কৌশল বটে। কিন্তু এই দীর্ঘ সময় ধরে ভারতের কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে এই নাটকীয়তা কেন?

১৯৫০ সালের মধ্যভাগ থেকেই জাতীয় কংগ্রেস এবং কংগ্রেস সরকার সম্বন্ধে রাশিয়ার মত পরিবর্তনের আভাস পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৫৪ সালের ৮ই অক্টোবর রজনী পাম দত্ত একটি প্রবন্ধে ভারতের কম্যুনিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, নেহরুর শান্তি নীতিকে সমর্থন কর (Support the peace policy of Nehru)।

এমনকি ১৯৫৫ সালের নভেম্বরে ক্রুশ্চেভ ও বুলগানিন ভারতে এসে গান্ধীজীকে 'মহাত্মা' এবং 'বিশিষ্ট নেতা' বলে অভিহিত করলেন।

এর পরই ১৯৫৬ সালে রাশিয়ার এশিয়া বিশেষজ্ঞ ঝুকভ দাবী করেন যে এযাবৎ গান্ধী সম্বন্ধে সঠিক 'information' না পাওয়ার জন্য তাঁরা গান্ধীকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন নি, বরং তাঁর ভুল 'assessment' করা হয়েছিল।[৭]

কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে রুশ কর্তৃপক্ষ গান্ধীজী ও তাঁর মতবাদের কড়া সমালোচনা করে আসছিলেন। ভারত বিশেষজ্ঞ সোভিয়েত তাত্ত্বিক দিয়াকভ গান্ধীকে 'a purely counter revolutionary ideology বলে বিদ্রূপ করেছিলেন।[৮] এমনকি ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী গান্ধীজীর মৃত্যুতে রুশ নেতৃবৃন্দ দুঃখ প্রকাশ তো করেনই নি, বরং যখন মস্কোতে নবগঠিত ভারতীয় দূতাবাসে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত গান্ধীজীর মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপনের জন্য একটা রেজিস্টার (খাতা) চালু করলেন, যোশেফ স্ট্যালিনের পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন কর্মীও সেই খাতায় তাঁদের নাম স্বাক্ষর করেন নি।[৯]

এখন ১৯৫৬-র ২৬শে জানুয়ারী প্রাভদা পত্রিকার সম্পাদকীয়তে নেহরুর তথা কংগ্রেসের পররাষ্ট্রনীতি এমনকি কিছু আভ্যন্তরীণ নীতিরও প্রশংসা করা হয়েছিল।

১৯৫৪সালে মস্কো থেকে ফিরে এসে অজয় ঘোষও দাবী করেছিলেন—পণ্ডিত নেহরুর শান্তিপূর্ণ বিদেশনীতি এবং দেশের ভিতরে প্রতিক্রিয়াশীল নীতিগুলির বিরুদ্ধে তাঁর জোরালো লড়াই-এর জন্য কম্যুনিষ্টদের তাঁকে সমর্থন করা উচিত।[১০] (The Peaceful aspects of Pandit Nehru's foreign policy and ruthless fight against the reactionary policies internally.)

সুতরাং কংগ্রেস সরকারের বিদেশনীতি সমর্থন করতে কম্যুনিষ্টদের আর কোন বাধা রইল না। এবার প্রশ্ন আভ্যন্তরীণ নীতির।

রাশিয়ার কংগ্রেস ও গান্ধী সম্বন্ধে এই নবমূল্যায়ণের প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই এখানে কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর পড়ল। ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসের পালঘাটে পার্টির চতুর্থ অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে এখন থেকে যত্রতত্র আর কংগ্রেসকে আক্রমণ করা হবে না। কেননা এখন থেকে কম্যুনিষ্টদের নীতি হবে 'ভাল কংগ্রেসীদেরকে বহু দূরে ঠেলে দেওয়া নয়, বরং তাদেরকে কাছে টেনে নেওয়া।'[১১]

এদিকে ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে তাসকন্দে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর শুরু হয়েছিল ইন্দিরা-যুগ। ইন্দিরা গান্ধীর প্রধান মন্ত্রীত্বে দ্বিতীয় বছরেই হল ১৯৬৭ সালের লোকসভা নির্বাচন। কংগ্রেস পেল মাত্র ২৮৩টি আসন, যেখানে ১৯৫২, ১৯৫৭ ও ১৯৬২-তে লোকসভায় কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৬৪, ৩৭১ ও ৩৬১। স্বভাবতই ইন্দিরা গান্ধী এই বিপর্যয়ে কিছুটা চিন্তিত হয়েছিলেন এবং তাঁর এই দুঃসময়ে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন কম্যুনিষ্টরা।

১৯৬৪ সালেই ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির কুমারমঙ্গলম্ পাটির কাছে 'A Review of the party since 1947' শীর্ষক যে থিসিস্ পেশ করেছিলেন তাতে পারস্পরিক 'give and take' নীতির অনুসরণ করে কম্যুনিষ্টদের কংগ্রেস সরকারে কাছাকাছি গিয়ে ক্ষমতার কিছু ভাগ নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল এবং নতুন রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষ করে ভারত-রুশ সম্পর্ক অন্যদিকে মোড় নেওয়ায় কুমারমঙ্গলমের থিসিস্ কম্যুনিষ্টদের কাছে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল।

মোহন কুমারমঙ্গলম্ কংগ্রেসের সঙ্গে 'made for each other' সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করলেন। তিনি কংগ্রেসকে এটা বোঝাতে সক্ষম হলেন যে, কম্যুনিষ্টরা আদৌ কংগ্রেসের শত্রু নয়, বরং পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মিত্র।

ইন্দিরা গান্ধী কম্যুনিষ্টদের নিরাশ করলেন না। প্রয়াত অধ্যাপক নুরুল হাসান (পঃ বঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল), আর গণেশ, চন্দ্রজিৎ যাদব, কে ডি মালব্য প্রভৃতি ভূতপূর্ব কম্যুনিষ্ট বা বর্ণচোরা কম্যুনিষ্টদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় স্থান দেওয়া হল। এমনকি ১৯৭১-এ লোকসভা নির্বাচনে যে ৩৫০ জন কংগ্রেস সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তার মধ্যে অন্তত ষাটজন ছিলেন ভূতপূর্ব কম্যুনিষ্ট, কংগ্রেসীদের চোখে 'had questionable political antecedents'।

অতএব চল্লিশের দশকে বিদেশী রাষ্ট্রশক্তির আনুকূল্যে কম্যুনিষ্টদের যে সুবর্ণ যুগের সূচনা হয়েছিল, স্বাধীনতা প্রাপ্তির ২১ বছর পর স্বাধীন ভারতে কম্যুনিষ্টদের সেই সুদিন আবার ফিরে এল কংগ্রেসী সরকারের দাক্ষিণ্যে।

কিন্তু কম্যুনিষ্টরা তাঁদের 'বিপ্লবী' ভাবমূর্তির ক্ষতি স্বীকার করেও কংগ্রেসীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এলেন কেন? আসলে কম্যুনিষ্টদের উদ্দেশ্য ছিল যে কোন ভাবে এদেশে রাশিয়ার প্রয়োজন মেটানো। ভূতপূর্ব কম্যুনিষ্ট নেতা সতীন্দ্র সিংহের ভাষায়— 'সোভিয়েত রাশিয়ার পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রয়োজন যাতে মেটানো যায়, সেজন্যই কম্যুনিষ্টরা কুমারমঙ্গলম্ থিসিস্ গ্রহণ করেছিলেন।'[১২]

অতএব, যাঁরা আশা করেন কম্যুনিষ্টরা এদেশে কংগ্রেসের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ইতিবাচক কোন সত্যিকারের বিরোধী ভূমিকা পালন করবে, তাঁরা যে শুধু মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন তাই নয়, তাঁরা ইতিহাসের সরল সত্যগুলোকেও অস্বীকার করতে চাইছেন। কংগ্রেস দল ও সরকার এদেশে রাশিয়ার স্বার্থ রক্ষার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার এবং তাই কম্যুনিষ্টরাও কখনও চাইবেন না তাঁদের পিতৃভূমির স্বার্থ এদেশে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হোক। এবং কম্যুনিষ্টরা এই সত্যটা কখনও লুকিয়ে রাখতে চান নি। ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৮৮, কলকাতায় পার্টির ষোড়শ রাজ্য সম্মেলন উদ্বোধনকালে সি পি আই (এম)-এর সাধারণ সম্পাদক ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ আর্জি জানিয়েছিলেন যেন রাজীব গান্ধী তথা কংগ্রেসকে কোনভাবেই ব্যতিব্যস্ত না করা হয়। শুধু তাই নয়, বিরোধীদের রাজীব সরকারের দুর্নীতি প্রকাশের ঘটনাগুলিকে তিনি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দুষ্টবুদ্ধির ফসল বলেও অভিহিত করেছিলেন। তাঁর মতে রাজীব সরকার প্রগতিশীল; কেননা 'রাজীব গান্ধীর সরকার সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে সমর্থন জানিয়েছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি নিয়েছে।'[১৩] এবং বিরোধীরা সেই রাশিয়ার বন্ধু-সরকারেরই বিরোধিতা করছেন। অতএব কম্যুনিষ্ট নেতার ভাষায় তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল, 'anti Soviet', 'anti China'[১৪]

তাই বিখ্যাত সাংবাদিক জয় দুবাসী যখন এদেশের কম্যুনিষ্টদের কথা বলতে গিয়ে লেখেন, রাশিয়ার জুতো পরিষ্কার করাই (Boot licking) এখানে কম্যুনিষ্টদের প্রধান কাজ, তখন হয়তো তিনি কিছু অত্যুক্তি করেন না।[১৫]

শুধু রাশিয়া নয়, এদেশে চীনের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়েও কম্যুনিষ্টরা একইরকম বিকৃত মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। ভারত-চীন যুদ্ধে কম্যুনিষ্টদের ভূমিকা কি ছিল তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আজও যখন কম্যুনিষ্টরা লোকসভায় দাবী করেন 'No Indian territory had been occupied by Chinese'[১৬] তখন চমকে উঠতে হয়, এরা কি আদৌ ভারতীয়! শুধু তাই নয়, ভারত সরকারকে কম্যুনিষ্টদের তরফ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে—'আমাদের আকসাই চীন ছেড়ে দেওয়া উচিত, কারণ তা আমাদের নয়' (We should give up Aksai Chin as it did not belong to us) এবং যুদ্ধের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল ভারতের, কেননা 'ভারত পেশী দেখিয়েছে,

তাই চীনও তার পেশী দেখিয়েছে' (You showed your muscle they showed their muscle)[১৭]

বিকৃতির চূড়ান্তরূপ কতটা হতে পারে তা বোঝা যায় নকশাল নেতা মহাদেব মুখার্জীর একটি বক্তব্য থেকে। ১৯৭০-এর মাঝামাঝি যখন সি পি আই (এম এল)-এর সৌরেন বসুকে চীনে পাঠানো হয়, তখন তিনি প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাইয়ের সঙ্গে দেখা করেন। আলোচনায় চৌ নকশালদের 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' স্লোগানটিকে ভুল, শিশুসুলভ ও অপরিণামদর্শী বলে জানিয়েছিলেন। ব্যক্তিহত্যার লাইনটিকেও মার্কসবাদ, লেলিনবাদ ও মাও চিন্তাধারা-বিরোধী বলে মন্তব্য করেছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে নকশাল নেতা মহাদেব মুখার্জী চৌ-এন-লাইকেই প্রতিক্রিয়াশীল, সংশোধনবাদী, বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিত করেছেন।[১৮]

এবার দ্বিতীয় প্রশ্নে আসা যাক। রাশিয়া-চীনের আজকের পরিবর্তনকে কম্যুনিষ্টরা কেন সমর্থন করছেন না, তা লুকিয়ে আছে এদেশের দীর্ঘদিনের কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের মধ্যেই। এই দীর্ঘসময় ধরে এরাই একবাক্যে সমর্থন করেছেন 'স্ট্যালিনীয় পার্জ', 'ব্রেজনেভ ডকট্রিন', আফগানিস্তানে রাশিয়ার সাম্রাজ্যবিস্তার এবং চীনের তিব্বত দখল। এখন হঠাৎ তাঁরা সুর বদলাবেন কি করে?

প্রশ্ন উঠতে পারে বর্তমান রুশ বা চীনা নেতৃবৃন্দ যখন তাঁদের পূর্বপুরুষকৃত ভুলগুলো স্বীকার করে নিচ্ছেন, তখন এদেশের কম্যুনিষ্টরা তা করছেন না কেন? এ ব্যাপারে সুন্দরভাবে আলোকপাত করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ডঃ কল্যাণব্রত ভট্টাচার্য : 'রাশিয়া বা চীনের বর্তমান নেতৃত্ব এ দাবী করতেই পারেন এবং তাই তাঁরা করছেন, যে স্ট্যালিন কিংবা মাও-সে-তুং এর আরণ্যক বর্বরতার সামনে তাঁরা মুখ খুলতে সাহস করেন নি। কিন্তু এদেশের কম্যুনিষ্টদের পক্ষে তো ওরকম দোহাই দেওয়া সম্ভব নয়।'

এই প্রসঙ্গে এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। ত্রিশ বছর আগে সোভিয়েত ফৌজ যখন চেকোশ্লাভাকিয়ায় ঢুকে দেশটাকে তছনছ করছিল, ফাঁসি কাঠে ঝোলাচ্ছিল চেক্ জাতীয় নেতৃবৃন্দকে, তখন প্রয়াত কম্যুনিষ্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী চিকিৎসার জন্য সে দেশের রাজধানী প্রাগ শহরে অবস্থান করছিলেন। একটি ছোট্ট দেশের উপর সোভিয়েত দৈত্যের এই নগ্ন বলাৎকার দেখে তিনি হঠাৎ কম্যুনিষ্ট দুনিয়ার রীতি ত্যাগ করে এর প্রতিবাদ করে ফেলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভারতের পার্টি থেকে সোমনাথ লাহিড়ীকে এমন তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা হয়েছিল যে তিনি এ ব্যাপারে আর কোনদিন মুখ খোলেননি। এরপর সোভিয়েত প্রধান ব্রেজনেভ দাবী করেন, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে সৈন্য পাঠানোর অধিকার সোভিয়েত রাশিয়ার আছে। ব্রেজনেভের এই সাম্রাজ্যবাদী দম্ভ, যা 'ব্রেজনেভ ডকট্রিন' নামে পরিচিত, কম্যুনিষ্টরা মহোৎসাহে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু গত ২৪শে আগষ্ট (১৯৮৮) সোভিয়েত ফৌজের নির্মমতার বিরুদ্ধে শুধু চেকোশ্লাভাকিয়া

নয়, খোদ মস্কো শহরে যখন মিছিল বের হয়েছিল এবং রুশ সরকার নামমাত্র বাধা দিয়ে মিছিল শেষ হতে দিয়েছিলেন, তখনই বোঝা গিয়েছে নতুন প্রধান গর্ভাচেভ চেক জাতীয়তাবাদীদের দাবীর যৌক্তিকতা মেনে নিয়েছেন। পূর্বসূরীদের ভ্রান্তি আর ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়ে রাশিয়া আফগানিস্তান থেকেও সৈন্য প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। কিন্তু সেদিন এদেশের কম্যুনিষ্টরাই আফগানিস্তানে সোভিয়েত সৈন্য প্রেরণকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

কম্যুনিষ্টদের এটা বোঝা উচিত, সময় এক জায়গায় বসে থাকে না। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সমস্ত ক্ষেত্রেই আজ ব্যাপক পরিবর্তন হয়ে গেছে। সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা আজ কম্যুনিষ্ট চীনের সেনা আধুনিকীকরণের সব থেকে বড় সহায়। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া আজ ইস্রায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়েছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, কম্যুনিষ্টদের বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সেই সৌখিন পাত্রটি আজ ভেঙ্গে টুকরো হয়ে গেছে। কিন্তু এই সত্যটা এদেশের কম্যুনিষ্টরা কিছুতেই বুঝতে চাইছেন না এটাই ভারতে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। প্রথমদিন থেকেই এদেশের কম্যুনিষ্টরা কোন প্রথম শ্রেণীর স্বাধীন বুদ্ধিজীবীকে তাঁদের সাথে পাননি। ফলে ভারতের সামাজিক অস্তিত্বটাই তাঁদের দেখতে হয়েছে রাশিয়া-চীনের চশমা চোখে লাগিয়ে এবং এদেশের সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন তাদেরই পথে। তাই আজ ওঁরা যখন বলেছেন, 'এ পথ ভুল, কোন প্রয়োজন ছিল না এই আরণ্যক বর্বরতার,' তখন পরজীবী কম্যুনিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা নতুন করে কিছু ভাবতে পারেন নি।

তাত্ত্বিক দিক থেকে এদেশে কম্যুনিষ্টরা কতটা দেউলিয়া তার প্রমাণ মেলে সি পি আই (এম) প্রকাশিত 'Role of Stalin, as the C.P.I. (M) Views it' বইটি থেকে। বইটিতে স্ট্যালিনের হাজারো গুণগান গাওয়া হয়েছে, যখন স্ট্যালিন নিজেই তাঁর দেশ রাশিয়ায় ধিকৃত। স্ট্যালিনকে রাশিয়াতে আজ শুধু 'ক্ষমতালোভী বর্বর- একনায়ক' হিসাবেই বর্ণনা করা হচ্ছে না ; ক্ষমতার লোভে তাঁর মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছিল, রাশিয়ার আজকের কর্তৃপক্ষ এরকম একটা বিশ্লেষণও বিশ্বের দরবারে হাজির করছেন। কিন্তু ১৯৮৭ সালে সি পি আই (এম) প্রকাশিত বইটিতে স্ট্যালিনের কাজকর্মের প্রসংশাসূচক বিশ্লেষণ করা হয়েছে ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত বিভিন্ন পার্টি দলিল উল্লেখ ক'রে এবং আরো মজার কথা ৪২ বছর আগের এই দলিলদু'টিও চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির স্ট্যালিন সম্বন্ধে মূল্যায়ন। ভারতের কম্যুনিষ্টরা তাঁদের নিজস্ব চিন্তাশৈলীর দুটো কথাও এখানে জুড়তে পারেন নি।

চিন্তাগত, তাত্ত্বিক, মানসিক সমস্ত দিক থেকে এই দারিদ্র দেশের লোকের কাছে কম্যুনিষ্টদের সম্মান যে বৃদ্ধি করেনি, গত সাত দশক ধরে এদেশে মার্ক্সবাদের অগ্রগতি অন্তত তাই প্রমাণ করে। দেশ গড়া তো দূরে থাক, কম্যুনিষ্টরা নিজেরাই আজ ভেঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছেন বিভিন্ন নামে। কিন্তু নিজেদের এই ব্যর্থতাকে কম্যুনিষ্টরা কোনদিন

বুঝতে চেষ্টা করেননি। বরং ব্যর্থতাজনিত তাঁদের এই হতাশার শিকার হয়ে তাঁরা আক্রমণ করেছেন জাতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় মহাপুরুষ, এদেশের সাধারণ মানুষকে। সংস্কৃত তাই কম্যুনিষ্টদের কাছে হয়েছে শোষক শ্রেণীর ভাষা, রবীন্দ্রনাথ হয়েছেন বুর্জুয়া কবি, বঙ্কিমচন্দ্র হয়েছেন সাম্প্রদায়িক, বিবেকানন্দ ভণ্ড সন্ন্যাসী।

এদেশের অতীতকে অস্বীকার করে, বর্তমানকে অবমাননা করে, শুধু চীন রাশিয়ার নাম কীর্তন করলেই মানুষ মুক্তি পায় না। ভারতের মাটিতেই ভারতের মুক্তি এই ঐতিহাসিক সত্যটা কম্যুনিষ্টরা বুঝতে পারলেন না এটাই দুঃখের।

ভিয়েৎনামী না কম্যুনিষ্ট, এই প্রশ্নের জবাবে হো-চি-মিনের স্পষ্ট জবাব ছিল, 'আমি প্রথমে ভিয়েৎনামী, তারপর কম্যুনিষ্ট। আমি জন্মেছি ভিয়েৎনামী হয়ে, কম্যুনিষ্ট হয়েছি পরে।' মাও-সে-তুঙ নিজে দেশের ব্যাপারে কতটা জাতীয়তাবাদী ছিলেন তা বোঝা যায় যখন তিনি বলেন— 'আমাদের দেশের কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন একটা ইতিহাস আছে। আছে এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সম্পদের ভাণ্ডার। ....বর্তমানের চীন সেই ইতিহাসের চীন থেকেই নির্গত হয়েছে। আমরা যেহেতু ইতিহাসকে দেখার মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্বাসী, সেহেতু আমাদের উচিত হবে না ইতিহাসের ধারাবাহিকতার সেই সূত্রটিকে ছিঁড়ে ফেলা। কনফুসিয়াস থেকে সান ইয়াৎ সেন পর্য্যন্ত ইতিহাসের একটা সংকলন করে আমাদের উচিত তার মূল্যবান উত্তরাধিকারকে সযত্নে রক্ষা করা।'[১৯]

কিন্তু কি করলেন ভারতের কম্যুনিষ্টরা? তাঁরা ভিয়েতনাম, রাশিয়া, চীনের স্বার্থে ভুলে যেতে চাইলেন নিজের মাকে। ফল হল সুদূরপ্রসারী। বিপ্লবের ছোবল হাত উঠিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একান্ত অসহায় ট্রাফিক পুলিশকে পার হয়ে আর রাইটার্স বিল্ডিং-এর অন্দরে প্রবেশ করতে পারল না। বিপ্লবের উৎসাহে উচ্চবিত্তদের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলির পরিবর্তে সাধারণ মানুষের কষ্টোপার্জিত পয়সায় তিল তিল করে গড়ে ওঠা সাধারণ স্কুলগুলিতেই শুধু আগুন ধরানো হয়েছিল। বিপ্লবের এই করুণ অবস্থা দেখে তাই হয়ত প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রবোধ কুমার সান্যাল লিখেছিলেন, 'তারা (কম্যুনিষ্টরা) ....যখন স্ট্যালিনের ছবি কাঁধে তুলে এপাড়া ওপাড়ায় হুজুগ বাধিয়ে তুলত, তখন ভারতের মন তাদের এই বিজাতীয়, বিধর্মীয় এবং অশ্রদ্ধেয় আচরণ লক্ষ্য করে কৌতুক এবং ঘৃণায় ভরে উঠত। কিন্তু দোল পূর্ণিমার রাত্রে হোলির রঙের বদলে একশ্রেণীর মাতাল যেমন নর্দমায় কাদা ছোড়াছুড়ি করে এবং পরদিন নেশা কাটবার পর আপন আপন দেহের দুর্গন্ধে নিজেরাই অপমানিত বোধ করে, এদের সেই দুর্দশা দেখে ভারতবাসী অসীম বেদনা ও করুণায় চুপ করে স্নেহের হাসি হাসত।'[২০]

নির্দেশিকা

লেখকের নাম, গ্রন্থ-পত্রিকা বা নথির নাম, প্রকাশের তারিখ, পৃষ্ঠা সংখ্যা এই পর্য্যায়ক্রমে উল্লেখিত হল।

১। Rajeswar Rao: Blitz: 27.12.'75.

২। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; তরী হতে তীর: p-337.

৩। Arun Bose: The Statesman-Miscellany: 1.5.'88.

৪। J D Sethi: Indian Express: 13.7.'87.

৫। E M S Namboodripad: Kerala—Yesterday, Today and Tomorrow, P. 143.

৬। The Hindu (Madras): 6.11.'62.

৭। Marshall Windmiller & Overstreet: Communism in India, P. 519.

৮। Sankar Ghosh: Socialism and Communism in India, P. 130.

৯। Lary Collins & Dominique La pierre: Freedom at Midnight P. 445.

১০। Ajoy Ghosh: New Age: 5.12.'54.

১১। Sankar Ghosh: Socialism and Communism in India, P. 332.

১২। Satindra Singh: Illustrated Weekly: 9 Jan, 1977.

১৩। বর্তমান: ৪. ১২. '৮৮.

১৪। The Statesman: 4.12.'88.

১৫। Jay Dubashi: Organiser: 18.12.'88.

১৬। The Statesman: 14.4.'86

১৭। ঐ।

১৮। আজকের ব্যতিক্রম: জুলাই, ১৯৮৫।

১৯। Mao-Tse-Tung: Art and Literature, P. 6.

২০। প্রবোধ কুমার সান্যাল: রাশিয়ার ডায়েরী।

পঞ্চম অধ্যায়

ভ্রান্তিবিলাশ

গৃহীত সিদ্ধান্ত কয়েক বছর পরেই ভুল বলে স্বীকার করে নেওয়া ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির ধারা। ইতিহাস-ই এর সাক্ষী। এমনই নানা স্বীকারোক্তি মাঝে মাঝেই জনসমক্ষে এসেছে, জন্ম দিয়েছে বিতর্কের। কিন্তু ভুল আর ভুল স্বীকারের রেওয়াজ থেমে থাকে নি। তাই এদেশের মার্কসবাদীদের যাত্রাপথ ঐতিহাসিক ভুলের এক ধারাবাহিক ইতিহাস।

১৯৩৯ সালে কম্যুনিস্টরা নেতাজীর 'লেফট কনসোলিডেসন কমিটি' ছেড়ে বেড়িয়ে এসেছিলেন। শুধু তাই নয় সুভাষ চন্দ্র বসুকে সে সময়ে তারা 'কুইসলিং', তোজোর কুকুর বলতেও দ্বিধা করে নি। এরপরে তিন দশক পরে ১৮৭০ সালে তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন। কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে জ্যোতি বসু বলেন কম্যুনিস্টদের এতদিনের মূল্যায়ন ছিল ভুল। ১৯৪৮ সালে বি টি রণদিভে শ্লোগান তোলেন 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়'। পরে অবশ্য রণদিভের লাইন ছেড়ে কম্যুনিস্ট পার্টি সংসদীয় গণতন্ত্রকে মেনে নেয়। ১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধের সময় মাওবাদীরা বলেছিলেন, ভারত আগ্রাসন নীতি নিয়েছে-চীন ভারতকে আক্রমণ করেনি, ভারতই আক্রমনকারী। সে সময়েই তাঁরা দল ভেঙে নতুন দল গড়েছিলেন সি পি আই (মার্ক্সবাদী)। পরবর্তী কালে অবশ্য কিছু নেতা তাঁদের নীতি বদলান। ১৯৭২ সালে চারু মজুমদারের মৃত্যুর পর এক সময় 'শ্রেণী শত্রু' নিধন যজ্ঞে নামা নকশালবাদীদের অনেক শাখাই স্বীকার করে নেয়, ওই হত্যার রাজনীতি ছিল সম্পূর্ণ ভুল সিদ্ধান্ত। ১৯৭৫ সালের জরুরী অবস্থাকে সমর্থন জানিয়েছিল সি পি আই। পরে সেই ফেলা থুথুই চাটতে হয় তাঁদের। ১৯৭৮ সালের ভাটিণ্ডা কংগ্রেসে পার্টি স্বীকার করে সেটা ছিল একটা বড় ভুল। ১৯৭৯ তে কম্যুনিস্টরা সমর্থন তুলে নেওয়াতেই পড়ে গিয়েছিল কেন্দ্রের প্রথম অকংগ্রেসী সরকার। মোরারজী দেশাইয়ের পতনের পরে আবার ফিরে আসেন ইন্দিরা গান্ধী। পরে ১৯৮০ সালে মাদুরাই অধিবেশনে সি পি আই (এম) স্বীকার করে নেয় সেও ছিল এক ঐতিহাসিক ভ্রান্তি।

এরকম স্বীকৃত ভুলের পাশাপাশি অস্বীকৃত ভুলও কম করেননি মার্ক্সবাদের অনুগামীরা। আর সেই ভুলের ধারাবাহিকতায় আজও কোন ছেদ নেই। তাঁদের একের পর এক এই ভুলের মাশুল যেমন নিজেরা গুনেছে তেমনই প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে জনগনকে। আসলে এসব ভুলের পিছনে দলীয় নীতির থেকে দলীয় স্বার্থই কাজ করেছে বেশী। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে যখন যেটা দলের কাছে প্রয়োজন হয়েছে সেটাই

হয়ে গেছে নীতি। সেটা রাজনীতি অর্থনীতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন পর্যন্ত। একদিন বুর্জোয়াদের কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে সমালোচনা করেও সাতের দশকের শেষ দিকে তাঁকেই মাথায় তুলে নেচেছেন স্বার্থের টানে। রবীন্দ্রনাথকে মেহনতী মানুষের কবি প্রমাণ করতেও আজ তাদের কম প্রচেষ্টা নেই। আত্বিক নেতারাও আজকাল আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা, কবিতা ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হন না।

কম্যুনিস্টরা দলের স্বার্থে তাঁদের নীতি বদলাতে অভ্যস্ত তা বহু প্রমাণিত। যেমন রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির বিষয়ে তাঁদের নীতি কোনদিনই একই ধারায় বয় নি। যখন যেমন রূপ নেওয়া প্রয়োজন দেখা গিয়েছে দলীয় স্বার্থ রক্ষার্থে বহুরূপীর ভূমিকায় তাঁরা সে রূপই নিয়েছেন। কখনও সমর্থক আবার কখনও বিরোধী। বাংলা সাপ্তাহিক স্বস্তিকায় ৯ ডিসেম্বর ১৯৯৬, সংখ্যায় ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত এক প্রবন্ধে দলীয় স্বার্থে মার্কসবাদীদের রাষ্ট্রপতি শাসনকে ব্যবহার করা বিষয়ে একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। সেখানে সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে মার্কসবাদীদের বহুরূপী চরিত্র। দীর্ঘকাল ধরে তাঁরা কিভাবে সুবিধাবাদকে আশ্রয় করতে পরস্পর বিরোধী নীতি গ্রহণ করেছেন, ৩৫৬ নম্বর অনুচ্ছেদ বাতিলের দাবি জানিয়েছেন বারবার অথচ অন্য দলের বিরুদ্ধে এর প্রয়োগকে সমর্থন জানিয়েছেন অত্যন্ত জোরালো ভঙ্গীতে। এই ভুল তারা তেমনভাবে কখনই স্বীকার করেননি কিন্তু একটিকে সঠিক বলে ধরে নিলে অপরটিকে স্বাভাবিক বুদ্ধিতেই বলতে হয় ভুল। ১৯৫৭ সালে কেরলে ক্ষমতায় আসে অবিভক্ত কম্যুনিস্ট দল। কিন্তু কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে মতবিরোধকে কেন্দ্র করে ১৯৫৯ সালে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। অভিযোগ ছিল রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নীতি ও ক্রিয়াকার্য রাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করেছে। কম্যুনিস্ট নেতা নেহেরুর সঙ্গে দেখা করেন। নেহরু রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার তিনটি প্রস্তাব দিলেও তাঁরা রাজি হন নি। বরং তাঁরা কথায় বার্তায় নেহরুকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন, যাতে ভারতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার একটা ব্যবস্থা নেয়। সে সময় ঠিক কি আলোচনা হয়েছিল জানা না গেলেও প্রখ্যাত সাংবাদিক শঙ্কর ঘোষ 'ভারতের রাষ্ট্রপতি ও তাঁর প্রধানমন্ত্রী' বইতে লিখেছেন ওই দুই নেতা প্রকারান্তরে বোঝাতে চেয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হবার পর তাঁরা কেন্দ্রের নিন্দা করতে ছাড়ে নি। তাঁরা গণতন্ত্র, সংবিধান এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছেন রাষ্ট্রপতি শাসন কায়েম হবার পর। সে সময় কেরল বিধানসভায় সরকারের গরিষ্ঠতা ছিল মাত্র দুজনের আর সব দল ও সম্প্রদায় তখন তার বিরুদ্ধে। "The result was that by the begining of 1959, all the opposition parties combined together and carried on a state-wide civil dis-obediance movement against the ministry (The Constitution of India, P-178)" তখন মার্ক্সবাদী নেতারা বুঝেছিলেন যে, একমাত্র কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ তাঁদের ভবিষ্যৎকে বাঁচাতে পারে নচেৎ কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ভবিষৎ অন্ধকার।

৩৫৬ নম্বর অনুচ্ছেদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল কম্যুনিস্টরা কথা বললেও এটা যে তাদের নৈতিক লড়াই ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৭৭ সালের ঘটনাতেও। জনতা দল সে সময় ক্ষমতায় এসেই নয়টি রাজ্যের কংগ্রেসী সরকার ভেঙে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে। আর এই বিষয়ে মার্ক্সবাদীরা ছিল প্রধান উৎসাহদাতা। ডঃ জোহারী লিখেছেন—"However, its most notorious instance should be found in the dismissal of 9 Congress Governments in june 1977" (Indian Government and Polities, P-237)। ডঃ অনুপচাঁদ কাপুরও জানিয়েছেন "The latest victim of act, 356 were the nine states of north India which were brought under the Presidents rule in one single stroke." (The Indian Political System P-191)।

মার্ক্সবাদীরা ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের জন্য আবার জোরালো দাবি তোলেন। "Articles 356 and 357 which enable the president to dissolve a state Government and its Assembly or both should be deleted" (Leftist Parties on Constitutional Change, P-13)।

১৯৮৩ সালে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে সুপারিশ করার জন্য সারকারিয়া কমিশন গঠিত হলেও কম্যুনিস্টরা ৩৫৬ নম্বর ধারা বাতিলের জোরালো দাবি তোলেন। অথচ পরে কেরলের কংগ্রেস সরকার ফেলার জন্য তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং সফলও হয়। আবার অযোধ্যায় বিতর্কিত সৌধ ১৯৯২ সালে ধ্বংস হবার পর উত্তরপ্রদেশ সহ হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ চারটি বিজেপি শাসিত রাজ্যে ৩৫৬ নম্বর ধারা প্রায়োগ করা হলে তখনও মার্ক্সবাদীরা তাতে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

ভুল করার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই। মানুষ মাত্রই ভুল করে। কম আর বেশী। কিন্তু এবিষয়ে অনন্য মার্ক্সবাদীদের আচরণ স্বাভাবিক জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদেরও হতচকিত, স্তম্ভিত করে দেয়। বুঝে ওঠা যায় না এটা ভুল না ডিগবাজির পর্যায়ে পড়ে। ১৯৯৭ এর অক্টোবরে উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল রমেশ ভাণ্ডারীর সুপারিশ অনুমোদন ক'রে বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশ সরকারের ওপর ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর ওপর চাপ সৃষ্টি করেন কম্যুনিস্টরা। রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণন অবশ্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সুপারিশ প্রত্যাখান করেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সি পি এমের পলিটব্যুরো সদস্য সীতারাম ইয়েচুরি প্রকারান্তরে দলের রাষ্ট্রপতি শাসন জারি কারার বিষয়ে সমর্থন করাকে ভুল বলে স্বীকার করে নেন। রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রের সুপারিশ মেনে নিলে এই ভ্রম সংশোধিত হত কিনা বলা যায় না তবে এটিই ভারতের মার্ক্সবাদীদের ভুল স্বীকারের দ্রুততম দৃষ্টান্ত।

এইভাবে যেখানেই স্বার্থের গন্ধ সেখানেই মার্কসবাদীরা নীতি বদলেছেন। ১৯৮৯-এর কেন্দ্র সরকারে গাঁটছড়া বাঁধা ভারতীয় জনতা পার্টি স্বার্থ মিটতেই হয়ে গেছে ঘোর সাম্প্রদায়িক, মধ্যযুগীয় বর্বর, অচ্ছ্যুৎ। অথচ' ৮৯ এর নির্বাচনের আগে কংগ্রেসকে

হঠাতে জোট বেঁধেছিল বাম-জনতা-বিজেপি। কলকাতার ময়দানে ভি পি সিং এর পাশাপাশি অটল বিহারী বাজপেয়ীরাও হাত ধরে প্রেস ফটোগ্রাফারদের কাছে পোজ দিয়েছিলেন জ্যোতি বসু। তখন ফর্মুলা ছিল শত্রুর (কংগ্রেস) শত্রু অবশ্যই বন্ধু।

১৯৯৬-এর লোকসভা নির্বাচনের সময় পশ্চিমবঙ্গ সি পি আই (এম)-এর রাজনৈতিক প্রচার পুস্তিকা (৪)-এ গৌতম দেব (নির্বাচনের প্রাক্কালে বি জে পি-র রাজনীতি) লিখেছেন "বি জে পি (১৯৭১ পর্যন্ত যার নাম ছিল ভারতীয় জনসঙ্ঘ) স্বাধীনতার পর থেকে সব ভোটেই লড়েছে। কিন্তু কখনও ১০ শতাংশ ভোটও পায় নি। 'রামচন্দ্র' জন্মস্থান (!) মুসলমানদের হাত থেকে মুক্ত করবার জেহাদ ঘোষণা করে এবং আগ্রাসী সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে দেশ ভরিয়ে দিয়ে প্রথম ১০ এর কোটায় পৌঁছালো ১৯৮৯ এর নির্বাচনে। '৮৪ তে যার লোকসভায় আসন ছিল দুটো, '৮৯-তে তা দাঁড়ালো ৮৫ তে এবং ১৯৯১-৯২ নির্বাচনে তা আরো বেড়ে হলো ১১৯। আর একটু বাড়াতে পারলে দিল্লির ক্ষমতা হাতে আসবে।" ওই পুস্তিকায় কিন্তু এই স্বীকারোক্তি নেই যে '৮৯ এর নির্বাচনে দেশে সাম্প্রদায়িক বিষবাস্প ছড়িয়ে বিজেপি ১০ এর কোটায় গেল আর সে নির্বাচনে মার্ক্সবাদীরা ছিলেন তাদের সঙ্গী। কংগ্রেসকে হঠাতে যে বিজেপি'র হাত ধরেছিলেন তাঁরা আবার সেই বিজেপিকে রুখতেই বেঁধেছেন কংগ্রেসের সঙ্গে গাঁটছড়া। ফর্মুলা সেই একই-শত্রুর (বিজেপি) শত্রু অবশ্যই বন্ধু। অথচ নির্বাচনের আগে বিপ্লব দাশগুপ্ত একটি পার্টি প্রচার পুস্তিকার নামই দিয়েছিলেন-"কেলেঙ্কারি, দুর্নীতি বা ঘোটালা যেভাবেই বলুন নাম তার কংগ্রেস।" আর নির্বাচনের পরে ঝোপ বুঝে কোপ মারতে চাইলেন কম্যুনিস্টরা। অজুহাত ধর্মনিরপেক্ষ ফ্রন্ট গঠন। দুর্নীতিবাজ কংগ্রেসের সমর্থনেও অরুচি নেই। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তো কংগ্রেসের কাঁধে চেপে প্রধানমন্ত্রীর তখতেও বসতে চেয়েছিলেন। বাধ সেধেছে দলীয় সিদ্ধান্ত। স্বপ্ন সম্ভব না হওয়ায় তিনি এতটাই ক্ষিপ্ত হন যে এই সিদ্ধান্তকে পার্টির এক 'ঐতিহাসিক ভুল' বলে আখ্যা দেন। অর্থাৎ ভারতীয় কম্যুনিস্টদের কাছে দল বা ব্যক্তির স্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্ত মানেই ভুল। তবে এসব ভুল স্বীকার করতে গেলে পার্টির মুখপাত্র গণশক্তিতে ভ্রম সংশোধনের একটা নিয়মিত কলম রাখতে হবে।

" আজ দেশের মানুষ এমন একটা শক্তিকে চান যাঁরা কংগ্রেস ও বিজেপি-র বিপদ থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারবে।"

অথচ বিজেপিকে আটকানোর নাম করে দু'দিন পরে গণশক্তির নতুন তত্ত্ব-

"জাতি আজ চাইছে, কংগ্রেস (আই) সংসদীয় দল সমান দৃঢ় প্রদর্শন করুক এবং সরকারের হাল যাতে কোন সাম্প্রাদায়িক দল না ধরতে পারে তার ব্যবস্থা নিক।"

যে কংগ্রেসের ইস্তাহার কম্যুনিস্টদের কাছে অচ্ছুৎ,

"কংগ্রেস যে ইস্তাহার বের করেছে তা মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে ভরা। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য ওরা ইস্তাহার প্রকাশ করেছে।"

এক মাসের মধ্যে সেই কংগ্রেসের ইস্তাহারকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। "তৃতীয় শক্তি এবং কংগ্রেসের 'সংযোগকারী গোষ্ঠী' গঠন করা উচিৎ।.....কোয়ালিশন গড়ার জন্য আমরা ক্রমশ একে অপরের কাছাকাছি আসছি, এজন্য বামপন্থীদের বক্তব্য, জনতা দলের কর্মসূচী, আঞ্চলিক দলগুলির আশা আকাঙ্খা এবং কংগ্রেস ইস্তাহারের মধ্যে অভিন্ন জায়গাগুলি খুঁজে বের করতে হবে।"

তবে কম্যুনিস্টদের সংশোধনবাদী কিন্তু বলতেই হবে। পশ্চিমবঙ্গে কুড়ি বছর বামফ্রন্ট শাসন চলার পর তাঁরা অনেক কিছুই এমন স্বীকার করেছেন মুখে অথবা কাজে। উদার অর্থনীতির চরম বিরোধিতা করেও সেপথেই নিয়ে গেছেন রাজ্যকে। বুঝতে পারছেন কম্যুনিস্টরা কংগ্রেস জমানায় কলকাতার পথে পথে হুকার বসানো ভুল হয়েছিল, আজ ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে। ভুল হয়েছিল কলকারখান, অফিস কাছারিতে ইউনিয়নবাজী প্রতিষ্ঠা করে, ঘেরাও কালচার চালু করে শ্রমিকদের কাজ করতে না বলা। আজ শিল্প, কলকারখানা মৃত্যুমুখে। ওয়ার্ককালচার নিখোঁজ। কৃষি থেকে শিক্ষা, সমাজ থেকে রাজনীতি সর্বত্রই শুধু ভুল আর ভুল।

নির্দেশিকা

লেখকের নাম গ্রন্থ-পত্রিকা বা নথির নাম পত্রিকার তারিখ এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা-এই পর্যায়ক্রমে উল্লেখিত হল—

১। গণশক্তি : ১৪-৪-'৯৬।
২। গণশক্তি : ১৬-৫-'৯৬।
৩। গণশক্তি : ১৪-৪-'৯৬।
৪। গণশক্তি : ২০-৫-'৯৬।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ওরা ভুল বুঝায়ও

“ওদের মিথ্যা কথার ফানুস, ফাঁসলো দেখে হাসছে মানুষ”—মধু গোস্বামীর লেখা ওই ছড়ায় সুর দিয়ে অনেক জনসভাতেই গেয়েছেন বামপন্থীরা। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস আজ মানুষের হাসির খোরাক বামপন্থীরাই। হলদিয়া, বক্রেশ্বর, শিল্পায়ন সব কিছুই যে কম্যুনিস্টদের নিছক কথাশিল্প তা বুঝে গেছে আমজনতা। সকলেই বুঝেছেন কোন কিছুই উন্নয়ণমুখী নয় বরং নির্বাচনমুখী। দীর্ঘ সত্তর বছর পার করেও যে দল আঞ্চলিক দলের বেশী কিছুই হতে পারেনি তার আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন থাকে বৈকী।

একদিন হাজার হাজার আদর্শবান যুবককে টেনেছিল যে কম্যুনিজম আজ তার এই দৈন্যদশা কেন ? আসলে কিছু মানুষকে কিছু দিনের জন্য বোকা বানানো গেলেও সমস্ত মানুষকে দীর্ঘ দিন বোকা বানিয়ে রাখা যায় না। এই সেদিনও এদেশের কম্যুনিস্টরা কথায় কথায় বিভিন্ন কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের উদাহরণ দিতেন। কিন্তু বাস্তবে আটের দশকের গোড়া থেকে গোটা বিশ্বে কম্যুনিজম যে কালরোগে আক্রান্ত তার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে শুরু করে, তা চরম রূপ নেয় আটের দশকের শেষে এসে। নব্বইয়ের দশকের শেষভাগে বিশ্বে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র বলে আর কিছু নেই। ১৯৮৯ সালের ৩রা অক্টোবর লিপজিগ-এ গণতন্ত্রের দাবিতে এক ঐতিহ্যাসিক অভুতপূর্ব বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। গোটা দেশ জুড়ে বিক্ষোভ। কম্যুনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠার ৪০-তম বার্ষিক উৎসবে শুরু হয়ে যায় জনতা পুলিশের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ। স্ট্যালিনপন্থী রাষ্ট্রপ্রধান এরিখ হোনেকার পূর্ব জার্মানী সফরে যান এবং সোভিয়েত রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভকে জানিয়ে দেন যে তিনি কট্টর কম্যুনিজম্ থেকে এক পাও পিছু হটবেন না। শুধু মৌখিক ঘোষণা নয়, দমন পীড়নও বাড়িয়ে দেন প্রচণ্ডভাবে। কিন্তু জনরোষের মোকাবিলা করা যায় নি। এক সপ্তাহের মধ্যে এরিখ হোনেকারকে তিন জন পলিটব্যুরো সদস্য-সহ গ্রেফতার হতে হয় দেশদ্রোহ, দুর্নীতি এবং অপশাসনের অভিযোগে। ৭ই নভেম্বর ৮ লক্ষ লোকের এক বিশাল সমাবেশে অবাধ নির্বাচনের দাবি ওঠে। দুদিন পরেই ৯ই নভেম্বর শুরু হয় বার্লিন প্রাচীর ভাঙার কাজ।

১৯৮৯ সালের ১০ই নভেম্বর হাঙ্গেরি তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র অস্ট্রিয়ার সংলগ্ন সীমান্ত খুলে দেয় এবং সেদিনই পূর্ব জার্মানীর ১৬ হাজার অধিবাসী চলে যান পশ্চিম জার্মানীতে। পূর্ব জার্মানীর ১ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৪৭ লক্ষ পূর্ব জার্মান থেকে পৌঁছে

যান পশ্চিম জার্মানে। এদিকে পূর্ব জার্মানেও শুরু হয়ে যায় গণতন্ত্রের দাবিতে জন বিক্ষোভ। ১৯৯০ এর ১০ই জানুয়ারী প্রদর্শিত জনতবিক্ষোভ থেকে দুই জার্মানীর একীকরণের দাবি ক্রমশ জোরালো হয়ে। দুমাস পরেই পূর্ব জার্মানীতে হয় অবাধ নির্বাচন। খৃষ্টান ডেমোক্রেটিক পাটি ৪৮ শতাংশ ভোট পেয়ে ১৯৩ টি আসন লাভ করে আর সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির দখলে আসে ৩১ শতাংশ ভোট পেয়ে ৮৭ টি আসন। কম্যুনিস্টদের ভাগ্যে জোটে মাত্র ১৬ শতাশং ভোট পেয়ে ৬৫ টি আসন। গঠিত হয় খৃষ্টান ডেমোক্রেটিক পার্টি আর সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির মোর্চা সরকার। কয়েক মাস পরেই ১৯৯০-এর ৩রা অক্টোবর দুই জার্মানী এক হয়ে যায়। অবসার হয় পূর্ব জার্মানীর কম্যুনিস্টতন্ত্রের।

ওদিকে ১৯৮৯ সালের ৭ই নভেম্বরে বিলুপ্তি ঘটে হাঙ্গেরীর কম্যুনিস্ট পাটির। সংসদের বিভিন্ন স্তরের ১৩ হাজার প্রতিনিধির মধ্যে এ'জন্য আক্ষেপ করেন মাত্র ১৫৯ জন। পোল্যাণ্ডে সলিডারিটি নামে এক অ-কম্যুনিস্ট ট্রেড ইউনিয়নের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ক'রে ১৯৮৯ সালে নির্বাচন করা হয়। তবে মাত্র এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ১৬২ টি আসনে। এরমধ্যে ১৬১ টি অসনে প্রার্থী দিয়ে সব কটিতেই জয়ী হয় সিলিডারিটি। বাকি দুই তৃতীয়াংশ আসনে কেবল একজন করে প্রার্থী থাকলেও মতামত প্রদান না করারও অধিকার ছিল জনগণের। ফল হল মারাত্মক। কম্যুনিস্ট সরকারের ৩৫ জন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি প্রদত্ত ভোটের বাধ্যতামূলক ৫০ শতাংশ না পাওয়ায় নির্বাচনই হতে পারে নি। নির্বাচনের সুযোগ নিয়ে জনগণ আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করল কম্যুনিস্ট সরকার। পোল্যাণ্ড মুক্তি পেল কম্যুনিস্ট তন্ত্রের রাহুগ্রাস থেকে। ১৯৯০ এর ২৭শে জানুয়ারী পোলিশ কম্যুনিস্ট পার্টি এক বিশেষ অধিবেশন ডেকে সেখানে নিজেরাই নিজেদের শ্রাদ্ধকর্ম সম্পন্ন করে।

চেকোশ্লোভাকিয়ার সংবাদ তাদের সংবিধান সংশোধন করে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রভাব শেষ কের দেয় ১৯৮৯ সালের নভেম্বরে। ১৯৯০ সালের ১১ই জুন অবাধ নির্বাচনে নাগরিক মঞ্চ আন্দোলন ৪৬ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হয়। কম্যানিস্ট পার্টির ভাগ্যে জোটে মাত্র ১৩.৬ শতাংশ। ১৯৮৯ সালের নভেম্বরে বুলগেরিয়ার স্ট্যালিন পন্থী স্বৈরতন্ত্রীদের ক্ষমতাচ্যুত করা হয় দীর্ঘ ৩৫ বছর ক্ষমতায় থাকার পর। এরপরে ১৯৯০ সালের ১৬ই জানুয়ারী বুলগেরিয়ার সংসদ সংবিধান সংশোধন করে সেদেশে কম্যুনিস্ট পার্টির একাধিপত্য খতম করে দেয়। কম্যুনিস্ট পার্টি নিজেদের নাম থেকে 'কম্যুনিস্ট' শব্দটাই হঠিয়ে দিয়ে সে জায়গায় বসায় 'সোস্যালিস্ট' শব্দ। রুমানিয়ার স্বৈরাচারী শাসক চাওসেস্কু জনবিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে নৃশংস অত্যাচার শুরু করেন। পরিণতিতে তাকে সস্ত্রীক গুলি খেয়ে মরতে হয়। যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট মার্শাল টিটো ৩৫ বছর স্বৈরতান্ত্রিক শাসন চালান। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর শুরু হয় ভাঙনের পালা। অবশেষে ১৯৯১ সালে যুগোশ্লাভিয়ায় বেধে যায় গৃহযুদ্ধ।

যে কম্যুনিস্ট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে কত সশস্ত্র বিপ্লব করতে হয়েছে, বিপ্লব কে

টিকিয়ে রাখতে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন কায়েম করতে হয়েছে, কণ্ঠরোধ করতে হয়েছে বিরোধীদের, প্রতিবিপ্লবীদের দমন করার নামে কোটি কোটি মানুষকে খুন করতে হয়েছে, সাম্রাজ্য জিইয়ে রাখতে সমরাস্ত্রের পিছনে ঢালতে হয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকা, সে সাম্রাজ্য ধ্বসে পড়েছে বালির বাঁধের মতো। আর আশ্চর্যের বিষয়, রুমানিয়া ছাড়া সর্বত্রই কম্যুনিজমের মৃত্যুঘণ্টা বেজেছে বিনা রক্তপাতে। কোন বহিঃশক্তির সাহায্য ছাড়াই বিশ্ব জুড়ে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলির অকাল মৃত্যু ওখানকার রাষ্ট্রবাসীদের ক্ষোভ, হতাশা, ঘৃণা আর অসন্তোষের পরিচায়ক। সোভিয়েত রাশিয়া এই সমস্ত ঘটনা দেখেছে চুপ করে। কারণ ততক্ষণে রাশিয়ারও ভেতরে ভেতরে ক্ষয় শুরু হয়ে গেছে। সে সময়কার সংবাদপত্রের কয়েকটি শিরোনামের ওপর নজর দিলেই বোঝা যাবে রাশিয়ার আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি কেমন ছিল।—

Hungry Moscovites Overjayed-
(The Telegraph (Calcutta) 31 Aug 1991)
Grbachev in Quagmive of Food-Politics
(The Sunday Times, London)
Soviet Foreign Debt Tops $ 81 billion
(Associated Press Report)
Soviet State Bank Declared Bankrupt-
(Financial Times)
Empty Pockets, Sky-high Prices
(Associated Press Report)
Starvation Ledds to Brain Drain
(Las Angeles Times-Washingon Post News Service)
Nationalism Replaces Communism in Sovet Union-John Thor Dahlburg
(Las Angeles Times-Washington Post News Sevice)
Communism Was Stupid, Say Women-W F Deedes
(Daily Telegraph (London) 9 Sept 1991)
(সবকটি শিরোনামের সঙ্গে প্রকাশের তারিখ দিতে না পারায় দুঃখিত।—লেখক)

অর্থাৎ সোস্যালিস্ট রাষ্ট্র থেকে কম্যুনিস্ট সমাজে উত্তোরণের আগেই মুখ থুবড়ে পড়ল রাশিয়া।

ভারতীয় কম্যুনিস্টরা কম্যুনিজমের স্বর্গরাজ্য রাশিয়া সম্পর্কে যে রঙীন চশমা পরিয়ে রেখেছিলেন তা ভেঙে চুড়মার হয়ে গেলে অতি করুণ ভাবে। ১৯৯১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর বর্ষ শেষের সঙ্গে সঙ্গে হল রাশিয়ার কম্যুনিজমের সূর্যাস্ত। ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর বলশেভিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে যে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ৭৪ বছর বয়সে তা নিক্ষিপ্ত হল বাতিলের ঝুড়িতে।

মজার কথা, টিকে থাকার আকুল প্রয়াসে কম্যুনিস্ট জারেরা যখন অত্যাচারের স্টীম

রোলার চালিয়ে দিয়েছেন জনসাধারণের উপর, আমাদের দেশের কম্যুনিস্টরা তাকে স্বাগত জানিয়েছেন দু বাহু তুলে। রাষ্ট্র শক্তির ঘাতক বাহিনীর প্রতিটি সন্ত্রাসের মধ্যেই ওঁরা খুঁজতে চেয়েছেন বিপ্লবের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস বিপ্লব ভেসে গেছে মানুষের ঘৃণা আর প্রতিবাদের জোয়ারে।

১৯৮৯ সালে বেজিং-এর গণতন্ত্রপন্থীদের উপর চীনের 'কম্যুনিস্ট' শাসকরা যে বর্বর দমন পীড়ন চালিয়েছিলেন তা সমর্থিত হয়েছিল এদেশের কম্যুনিস্টদের দ্বারা। গণতন্ত্রপ্রেমী ছাত্রদের এই আন্দোলনের মধ্যে ভারতের কম্যুনিস্টরা খুঁজে পেয়েছিলেন পুঁজিবাদী চক্রান্ত। তাই আন্দোলনরত নিরস্ত্র ছাত্রদের চীনা সরকার যখন ট্যাঙ্ক চালিয়ে দিয়েছিলেন তখন এদেশের কম্যুনিস্টরা তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন বিপ্লবের বিজয় বলে। কিন্তু '৯৭-এর নভেম্বরে মার্কিনদেশ সফররত চীনা প্রেসিডেন্ট জিয়াং জেমিন স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে ১৯৮৯ সালে বেজিং-এর তিয়েন-আনমেন স্কোয়ারে গণতন্ত্রপন্থীদের উপর বলপ্রয়োগ করা ভুল হয়েছিল। এবার এদেশের কম্যুনিস্টরা কিভাবে পুনর্বিচার করবেন তাদের মূল্যায়ন ?

—

ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি না হয়ে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি হল কেন? তার ফল কি হয়েছিল? অবিভক্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতারা কি ইংরেজ সরকারের কাছে মুচলেকা দিয়েছিলেন? কম্যুনিষ্ট পার্টি কি ৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনকে **Sabotage** করার ১২০ পাতার **Performance Report** বৃটিশ সরকারের কাছে পেশ করেছিল? গান্ধীজী, নেতাজী, জয়প্রকাশ নারায়ণকে নিয়ে কী ধরনের ব্যঙ্গচিত্র কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্রে ছাপা হত? পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি পি. সি. যোশীর ইংরেজ সরকারের হোম মেম্বার রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা কিসের? মুসলীম লীগের 'পাকিস্তান দাবী' কাদের দৃষ্টিতে **Just, Progressive and Democratic** ছিল? গোর্খাদের জন্য আলাদা সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবী কারা করেছিল? নকশাল নেতা মহাদেব মুখার্জ্জী চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাইকে প্রতিক্রিয়াশীল, সংশোধনবাদী এবং বিশ্বাসঘাতক বলেছিলেন কেন?

ছাত্রশক্তি **রাষ্ট্রশক্তি**

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষে অমলেন্দু চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স, ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।